KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: 28 টেমার লেন, কলকাতা-৯
Collection: KLMLGK	Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: 22/- 22/- 22/- 22/- 22/-	Year of Publication: মাঘ ১৩৮১ ॥ Feb 1974 ফাল্গুন ১৩৮১ ॥ March 1974 ভাদ্র ১৩৮১ ॥ Sep 1974 কার্তিক ১৩৮১ ॥ Nov 1974 অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ॥ Dec 1974
	Condition: Brittle / Good ✓
Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks:

C.D. Roll No.: KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৮১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিশ্বভারতীর বই

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

পুরানো কথা

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজ-ভক্ত ভারতীয়রা শোষণে-পীড়নে শাসকগোষ্ঠির কতোটা সহায়ক ছিলেন অনেক উজ্জ্বল ঘটনার সঙ্গে যে-সব কাহিনী এই গ্রন্থে লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর অনবদ্য প্রকাশ-ভঙ্গিমায়। প্রভূত ঘটনার জাল, তদানীন্তন আলোচনাকারী ঘটনা যে-ভাবে চারুচন্দ্র দত্ত গল্পচ্ছলে এখানে উপস্থাপন করেছেন সাহিত্য-পিপাসুমন মাত্রেই এতে রসসিক্ত হবে।

এই গ্রন্থপাঠে কোনো সময়েই মনে হবে না লেখক ছিলেন একজন আই-সি-এস। তিনি যে ভারতবাসী এ কথা তিনি কখনোই ভুলতে চান নি, নকল ইংরেজ সাজার কোনো চেষ্টাও তিনি করেন নি। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ : প্রতি খণ্ড ৩·০০টাকা।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে একটি বৃহৎ দেশকালের রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস। বিধৃত হয়েছে খ্রীষ্টানির সঙ্গে হিন্দুয়ানির বিরোধ, তাৎকালিক সাময়িক পত্র পত্রিকা এবং গ্রন্থ প্রকাশের ইতিবৃত্ত, বাংলা গদ্যের ধীর অথচ সুনিশ্চিত পদক্ষেপের কাহিনী। রঙিন চিত্র ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদে ভূষিত। মূল্য ১২·০০, শোভন ১৫·০০ টাকা।

শ্রীমলিনা রায়

চার্ল্‌স ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী বন্ধু, গান্ধীজি ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সহোদর তুল্য চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজের বহুবিচিত্র জীবনের সরস ও সুখপাঠ্য আলেখ্য। বহুবর্ণ চিত্র, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলংকৃত। মূল্য ১০·০০ টাকা।

মৃণালিনী দেবী

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ যা বিভিন্ন পত্রিকায়, গ্রন্থে ও পাণ্ডুলিপিতে ছড়িয়ে আছে—কবিপত্নীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংকলিত এই গ্রন্থে তাঁর একটি সমগ্র পরিচয় পাওয়া যাবে। অনেক তথ্য ও চিত্র সংবলিত। মূল্য ৩·৫০ টাকা।

বিশ্বভারতী

১০, প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা-১৬

দ্বাবিংশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ তেরশ' একাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারতরত্ন বোপদেব ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ৩৯৫

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ নবেন্দু সেন ৪০৩

ঋগ্বেদে কৃষিবিজ্ঞানের পরিচয় ॥ অমিয়কুমার মজুমদার ৪১০

ভারতীয় প্রেক্ষিতে বাঙলা-কলম ॥ ভোলানাথ ভট্টাচার্য ৪১৬

মানভূমের কথ্য শব্দার্থ ॥ রামশঙ্কর চৌধুরী ৪২০

সমালোচনা : সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ॥ প্রফুল্লকুমার পাল ৪২৩
কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি ॥ সন্তোষকুমার বসু ৪২৪

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

মাঘ
তেরশ' একাশী

সমকালীন

দ্বাবিংশ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারতরত্ন বোপদেব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

কোনও অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের ব্যক্তি-জীবনের কথা-কাহিনী আর কৃতি-কর্মের ইতিহাস জানতে গেলেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের দুটি প্রখ্যাত লোকোক্তি মনে পড়ে—'বিদ্বান্ পুরুষ, আর কুলবতী রমণী এবং লতিকা এঁরা যদি যোগ্য আশ্রয় না পায়, তবে তাদের শোভাও থাকে না, আর সমাজে মান্যতা অর্জনও কদাচিৎ' 'অনাশ্রিতা ন শোভন্তে বিদ্বাংসো বণিতা লতাঃ'।

আর একটি লোকস্থক্তি—'গুণবন্তোঽপি সীদন্তি গুণগ্রাহী নচেদ্ভবেৎ।
স্বগুণ পূর্ণকুম্ভোঽপি কূপে যথা নিমজ্জতি॥'

অর্থাৎ এ-সংসারে গুণবান অনেকেই থাকেন, কিন্তু তাঁদের গুণগ্রহণ করার লোক যদি না থাকে, তবে তেমন গুণিরা কখনই জনসমাজে পরিচিত হন না; সমাদরও পান না; যেমন, গুণবান পূর্ণকুম্ভকে কোন গুণগ্রাহী যদি টেনে না তোলে কুয়ো থেকে, তবে গুণযুক্ত পূর্ণকুম্ভটি কুয়োতেই ডুবে যায়। (গুণ শব্দটি এখানে দ্ব্যর্থযুক্ত) বিশেষ প্রকৃতি এবং রজ্জু উভয়েই গুণার্থক।

এমনি লোকোক্তির লক্ষ্য বিশ্বে অনন্তকাল থেকে; অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, লোকতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক প্রভৃতি যে কোনও মানব-সমাজের তত্ত্বাষ্টে প্রচলিত। মহৎ প্রতিষ্ঠান অথবা মহান্ ব্যক্তির আশ্রয়ে না এসে কোন সুধীই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নাই। ব্যতিক্রম থাকতে পারে কোথাও কোথাও।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৈয়জীবন, বৈয়াকরণ, শাব্দিক, নৈয়ায়িক, সাহিত্যিক, ভাগবত দার্শনিক বোপদেবের জীবনটি ছিল অকৃত্রিম বন্ধু রাজমন্ত্রী হেমাদ্রির আশ্রিত এবং তাইতেই সমুজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত। একথা বোপদেব নিজেই স্বীকার করেছেন—

(১) বিছৃষা বোপদেবেন মন্ত্রি হেমাদ্রি তুষ্টয়ে। (হরিলীলাবিবরণ)

(২) হেমাদ্রিণার্জিতংমুক্তা-ফলং পশ্যত কৌতুকাৎ। (মুক্তাফল)

(৩) হেমাদ্রির্বচসাং মুক্তাফলং রত্নং হৃদি প্রভোঃ। ,,

(৪) হেমাদ্রিমাদ্রিয়ত এব গুণেন যেন, তেনৈব পূরিত সুখেন সুবন্ধমেতৎ (মুক্তাফল)

(৫) হেমাদ্রিঃ স্বম্পাটীতঃ সূর্যবৃত্তপ্রদক্ষিণঃ। (মুক্তাফল)

(৬) হেমাদ্রি র্বোপদেবেন মুক্তাফল মচীকরোৎ। ,,

ঠিক্ এমনি করেই বোপদেব-বন্ধু হেমাদ্রিও বন্ধু বোপদেবের প্রশংসা করেছেন তাঁর বিশেষ গ্রন্থ মুক্তফলের টীকায়—

(১) অতত্বে তত্ত্ববীর্যেষাং তত্বে চাতত্ত্বধীনৃর্ণাম্।
ন আনানন্দয়ত্যেতা বোপদেবস্য সূক্তয়ঃ॥

বোপদেবের লোকোত্তর প্রতিভা স্মরণ করে বন্ধু হেমাদ্রি লিখেছেন—

(২) যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যরচনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ
প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেহথ তিথি নিধারার্থমেকোহদ্ভুতঃ
সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবত তত্বোক্তৌ ত্রয়স্তস্য চ
ভূগীর্বাণ শিরোমণিরিহ গুণাঃ কেকেন লোকেত্তিরাঃ॥ (মুক্তাফল টীকা)

অর্থাৎ বন্ধু বোপদেবের প্রতিভা লোকোত্তরা নিঃসন্দেহ, নইলে একটি জীবনে এ মহান গ্রন্থরাজি কি রচিত হতে পারে? ব্যাকরণে দশখানি (মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সহ) বৈদ্যশাস্ত্রে নয়খানি, ধর্মশাস্ত্রে (স্মৃতিশাস্ত্রে) ১ খানি (চতুর্বর্গ চিন্তামণি) সাহিত্যে ৩ খানি, ভাগবত বিষয়ে ৩ খানি (পরমহংস-প্রিয়া, মুক্তাফল ও হরিলীলা)। অতএব স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে বোপদেবের অমন গুণগ্রাহী 'হেমাদ্রি' নামের বন্ধুটি কবেকার? কোথাকার পুরুষ? কি তাঁর পরিচয়?

ভারত ইতিহাসের প্রখ্যাত রাজবংশগুলির অন্যতম চালুক্যরাজ। আজকের দৌলতাবাদ আর প্রাচীন নাম দেবগিরিই রাজধানী ছিল একদিন চালুক্য বংশীয়দের। দেবগিরি রাজ্যের সীমানা ছিল নাসিক পর্যন্ত। এ রাজ্যটি হালফিল নিজাম রাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এ বংশের ইতিহাসে জানা যায় ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'ভিল্লম্' নামে প্রথম রাজা বল্লালের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে নিহত হন। তারপর ১২১০ অব্দে শিংবণ (সিংহণ?) নামে আর এক প্রতাপশালী পুরুষ দেবগিরির সিংহাসন লাভ করেন। ইনিই গুজরাত এবং অন্যান্য ক্ষুদ্ররাজ্যগুলি আক্রমণ করে কিছুদিনের জন্য চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সমপর্যায়ে এনে রাজত্ব করেন। এ ইতিহাস পাওয়া যায় ১২১৯ থেকে ১২২৯-র মধ্যে জয়সিংহ সূরির রচিত 'হম্বীর মদমর্দন নাটক' থেকে।

তারপর ১২৯৪ অব্দের সমসাময়িক কালে এই বংশটি বিলুপ্ত হয়ে যায় মুসলমানদের বিজয় অভিযানে। ঐ সময়েই দিল্লীর বাদশাহ আলা উদ্দীন নর্মদা নদী পার হয়ে এই রাজ্যটিকে আক্রমণ করেন, সে সময় এ বংশের রাজা রামচন্দ্র আলাউদ্দীনের সঙ্গে সংগ্রাম না করে তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন এবং নজরানা দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে রাজ্যটিকে রক্ষা করেন। এই নীতি তিনি আবার একবার গ্রহণ করেন। সেটি ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন মালিক কাফুর আবার আক্রমণ করেন।

এ বংশের ইনিই শেষ স্বাধীন রাজা। এঁরই সময় এঁরই অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন হেমাদ্রি। বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও ধর্মশাস্ত্রের (স্মৃতিশাস্ত্রের) প্রখ্যাত পদ্ধতিকার হেমাদ্রি। এঁর নামে প্রচারিত যে স্মৃতিশাস্ত্রটি অদ্যাবধি হিন্দুসমাজে সর্বাধিক প্রামাণ্য মনে করা হয় এবং যাঁর উল্লেখিত সূত্রগুলি ষোড়শ শতকের রঘুনন্দনও প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন তাঁর অষ্টবিংশতি তত্ত্বে, সেই হেমাদ্রি ছিলেন দেবগিরির (দৌলতাবাদের) রাজা রামচন্দ্রের মাননীয় পুরুষ। এক সময় এই রামচন্দ্র ওই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীও ছিলেন। সেটা রামচন্দ্রের খুল্লতাত মহাদেব যখন রাজা হন।

১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাদেবের জামাতা হরপাল লোকান্তরিত হলে পর এই যাদব বংশটির অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু হেমাদ্রির নাম চিরতরে ভাস্বর হয়ে আছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন দেবগিরির রাজমন্ত্রী হেমাদ্রির নামে স্মৃতিশাস্ত্রটি (চতুর্বর্গ চিন্তামণি) প্রচলিত থাকলেও এ গ্রন্থের প্রকৃত লেখক বোপদেব। আরও কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা বোপদেব, তবুও তাদের অনেক গ্রন্থের লেখকের নাম তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু হেমাদ্রির নামেই প্রখ্যাপিত। বন্ধুত্বের নিদর্শন। অকপট ভালবাসার স্মৃতি-স্থাপন। এমন স্মৃতিস্থাপন কিন্তু অর্থপ্রাপ্তির বিনিময়ে নয়। যেমন বহুক্ষেত্রে হয়ে থাকে—বাংলার প্রখ্যাত শব্দ কল্প দ্রুম, বাংলা ভাষায় অনূদিত মহাভারত, হুতোমী নকসা ইত্যাদি। বোপদেবের জীবন-কাহিনীর অনেক অংশ হেমাদ্রির জীবন-চরিতের সঙ্গে মিশে রয়েছে, আবার হেমাদ্রির অনেক অনেক কৃতিকর্ম বোপদেবের সঙ্গে আছে। উভয় পুরুষই মহারাষ্ট্রের গৌরবরত্ন।

এককালে হেমাদ্রি বন্ধু বোপদেবকে বলা হত ইনিই শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণের প্রকৃত লেখক। কারণ ভাগবতে যে সব সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ করা রয়েছে, সেগুলির শব্দসিদ্ধি, প্রত্যয়সিদ্ধি অন্য ব্যাকরণ পাঠার্থীর পক্ষে সুখকর নয়। কিন্তু বোপদেব রচিত 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ যারা অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের কাছে ভাগবতের শব্দার্থ বোঝা কঠিন হয় না।

বোপদেবের পাণ্ডিত্য এবং বৈষ্ণবধর্মের (ত্রয়োদশ খ্রীঃ) মর্মার্থ-জ্ঞাপন এত গভীর যে, ভাগবতের রচয়িতা হিসাবে তাঁর পরিচয় উল্লেখিত হলেও নিরর্থক হয় না, সার্থক হয়।

ভারতে যতগুলি পুরাণ গ্রন্থ আছে তাদের রচনাকাল কোন্‌টির কবে তা পণ্ডিতদের কাছে অজ্ঞাত নয়, কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের কাছে পুরাণগুলি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের লেখা, এই সংস্কার বেশ কালবহ হয়ে আসছে। স্কন্দ পুরাণে রামানুজ আচার্যের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ পণ্ডিতরা জানেন শ্রীরামানুজ ১১ দশ শতাব্দীর পুরুষ। তেমনি শ্রীবোপদেবের জীবন-কাহিনী ও ভবিষ্যপুরাণে (প্রতি সর্গ পর্ব দ্বিতীয় খণ্ড ৩২ অধ্যায়ে) উল্লেখিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুরুষ।

ঐ পুরাণে বলা হয়েছে, 'তোতাদ্রিবাসী বোপদেব বেদবেদাঙ্গ পারগ কৃষ্ণভক্ত, তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে গোপীজন বল্লভকে মানসপূজা করে বর্ষান্তে শ্রীহরির সাক্ষাৎ হয়ে তাঁকে অনুপম জ্ঞান দান করেন, এবং তাঁর হৃদয়ে ভাগবতী কথা সমুদয় জাগ্রত হয়, শ্রীভগবানের আদেশে নর্মদা নদীর তীরে এসে শুভ-কথা শুনিয়ে বিষ্ণুভক্তগণকে আনন্দিত করেন।

বোপদেবের এই পৌরাণিক সংবাদটির সঙ্গে তাঁর নিজের লেখা একটি শ্লোকের বক্তব্যের বেশ মিল পাওয়া যায়—শ্লোকটি লিখেছেন আয়ুর্বেদের যে নয়খানি নিবন্ধ গ্রন্থ তাদের মধ্যে 'শত শ্লোকী'ও

একটি। এরই অন্তিম শ্লোকগুলির অন্যতম শ্লোকে বলেছেন—

দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা—
স্থানং দেবপদাস্পদাগ্রজগণা গণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রামীষু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ
চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥

অর্থাৎ দেশের মধ্যে সেরা দেশ বরদা নদীর তটে ঐ 'সারথ' গ্রাম, ও গ্রামটি মহাস্থান, কারণ ওখানে বাস করেন সহস্র ব্রাহ্মণ। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ধনেশ আর কেশব, আমি বোপদেব সেই বৈদ্য ব্রাহ্মণ ধনেশের ছাত্র আর বৈদ্য ব্রাহ্মণ কেশবের পুত্র। এ গ্রন্থের লেখক হিসাবে এই আমার পরিচয়।

ত্রয়োদশ শতকের ভারতে ব্রাহ্মণগণ নিজদিগকে বৈদ্য ব্রাহ্মণের সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে খুবই গৌরববোধ করতেন। ষোড়শ শতকের রঘুনন্দনের আমলে বাংলায় কিন্তু ব্রাহ্মণের বৈদ্য পরিচয়টা গৌরবের না হয়ে একটা পরগাছা শ্রেণীর বৃক্ষলতার মত হয়ে আছে; বাংলায় 'বৈদ্য' বলে যারা পরিচিত তাঁরা সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে আছেন। এঁরা দাক্ষিণাত্য যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ হয়েও অজ্ঞাত কারণ সংস্কারের বশে না পারেন নিজেদিগকে ব্রাহ্মণ বলতে আর না পারেন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কোন একটি বর্ণে পর্যায়ে নিজদিগকে থ্যাপিত করতে।

এক বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোন প্রদেশে বৈদ্যব্রাহ্মণ বলে নিজেকে পরিচিত করা খুব মান্যতার হয়। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, এবং উৎকল ও তামিল কেরালায়। আসামে বেজ বড়ুয়া খুব মাননীয়।

এই জন্য বোপদেব তাঁর প্রতিটি গ্রন্থের অন্তিমে নিজের পরিচিতি জ্ঞাপনের একটি সংক্ষিপ্ত শ্লোকে নিজেকে বিঘোষিত করেছেন—

বিদ্বৎ-ধনেশ শিষ্যেণ ভিষক্ কেশব সুনুনা।

বোপদেব যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের সব গ্রন্থই এখনও মুদ্রিতাকারে দৃষ্টিগোচরে আসে না। ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ', 'কবিকল্পদ্রুম', 'উণাদিবৃত্তি', 'কারকবৃত্তি' এই চারিখানিই অদ্যাবধি মুদ্রিত হয়েছে। তাদের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধির পক্ষে প্রখ্যাত পণ্ডিতদের টিকা রচনাও যেমন একে প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি অন্যান্য সংস্কৃত ব্যাকরণ অপেক্ষা 'অভিনবত্ব' থাকার জন্যও এর প্রসিদ্ধি।

কোন ব্যাকরণ এমন সংক্ষেপে সংকেত সূত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। 'অচ্' এইমাত্র সংজ্ঞায় স্বরবর্ণের সংপুট বিধান এবং কুচুটুতুপু এই সংজ্ঞায় সমগ্র ব্যঞ্জন বর্ণকে নিবদ্ধ করার সংজ্ঞা কেউ দেখান নি। সন্ধি, শব্দ, ধাতু, কারক, সমাস, তদ্ধিত প্রভৃতি ব্যাকরণের মূল বক্তব্যগুলি যে ইঙ্গিত সংকেতে এবং বর্ণমাত্র সংজ্ঞায় নিবদ্ধ করা যায় বোপদেবের আগে এমন কোন পণ্ডিতের মেধায় বিকাশ পায় নি।

এতে যদিও অন্যান্য ব্যাকরণের তুলনায় এটি-খুব কঠিন হয়েছে, কিন্তু এই ব্যাকরণটিকে পকেটে রেখে সদাপাঠ্য একখানি উৎকৃষ্ট অভিধানের মত একমাত্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকেই দেখা যায়।

বাংলার প্রখ্যাত পণ্ডিত ভটিকাব্যের টীকাকার, কারকোল্লাসের বৃত্তিকার, রত্নপ্রভা, চন্দ্রপ্রভার (বৈদ্যকুল পঞ্জিকা) রচয়িতা এবং শোনা যায় বৈদ্যক গ্রন্থেরও টীকাকার বৈদ্য-ব্রাহ্মণ মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক মহাশয় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা রচনা করে ভারতের সংস্কৃতসেবী পণ্ডিতদের কাছে এটিকে অমূল্য সম্পদ করেছেন। বোপদেব যে ব্যাকরণে সাতখানি গ্রন্থ নির্মাণ করেছেন, সেগুলির এখনও মুদ্রিত রূপ দেখি নাই।

ঠিক তেমনই ঘটেছে তাঁর আয়ুর্বেদের অভিনব রূপময় নয়খানি গ্রন্থের ব্যাপারে। এখন মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় 'শতশ্লোকী' নামে একখানি মাত্র গ্রন্থ। তবে এই একখানি গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায় কি অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন বোপদেব। মাত্র একশটি শ্লোকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গ্রন্থটি নির্মাণ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে চূর্ণ ভৈষজ্যের দ্বারা রোগনিরাময়ের যোগগুলি নিবদ্ধ করেছেন। এতে আছে ১৬টি শ্লোক। অর্শ, রাজযক্ষা, প্লীহা, মূত্রবাত, হৃদ্‌রোগ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, বাজীকরণ, আম বাত, অতিসার, শূল ও গ্রহণী রোগেরক্ষেত্রে প্রতিযোগের সঙ্গে অন্যান্য ভেষজের চূর্ণের দ্বারা ব্যাধি দূর করার ব্যবস্থা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বটিকা। তৃতীয়ে অবলেহ, চতুর্থে ঘৃত। পঞ্চমে তৈল এবং ষষ্ঠে পাচন। চরক সুশ্রুতে উল্লেখিত প্রায় সব রোগেরই চিকিৎসার জন্য বোপদেবের সংক্ষেপিত এই শতশ্লোকী গ্রন্থ।

অবশেষে দুটিমাত্র শ্লোকে বায়ু পিত্ত ও কফের স্বরূপ, তাদের অবস্থান এবং তাদের ত্রুটি ঘটলে যে সব রোগের উদ্ভব হয়—তাদের নিরাময় করতে হলে মূলতঃ কোন্ পথ অবলম্বন করবেন চিকিৎসক তারই উপদেশ করেছেন। সাধারণ প্রতিভায় এভাবে ঐ বিশাল আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্তকে এমন করে সম্পূটিত করা যায় না।

তা ছাড়া ঐ একশতটি শ্লোকের জন্য কোথাও অনুষ্টুপ, ইন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল, বসন্ততিলক, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি কবিপ্রিয় ছন্দগুলির আশ্রয় নিয়ে গ্রন্থের বক্তব্যকে অস্ফুট করে রাখেননি, প্রতিটি বিষয়কে বেশ বিস্তৃত করার জন্য স্রগধরা ও শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দের দ্বারা যথাযথ বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থের শেষে একটি শিখরিণী ও একটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে চিকিৎসকদিগকে তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য এবং বায়ু-পিত্ত-কফের বিকারে কোন্ কোন্ রসের পথ্য এবং সদ্‌পানের জন্য কোন্ কোন্ রস মুখ্য তারই উপদেশ দিয়েছেন।

এই শতশ্লোকী গ্রন্থে বিশেষ লক্ষণীয় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পূর্বেই ভারতের 'রসচিকিৎসক' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যের দ্বারা তাঁরা একটি বিশেষ ধরণের ভৈষজ্য-বিদ্যার আবিষ্কার করেন, যাহাদিগকে বলা হয় রসতান্ত্রিক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বহু ঔষধ অদ্যাবধি ভারতের কবিরাজগণ পরম সমাদরে প্রস্তুত করে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অন্যতম মুখ্য অঙ্গ করে সেগুলি প্রয়োগ করে সফলকাম হন। বাংলায় এ পদ্ধতিটি খ্রীষ্টীয় ১১ দশ শতকের চক্রপাণি দত্ত মহাশয়ই প্রথম প্রবর্তন করেন।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের বোপদেব তাঁর শতশ্লোকী গ্রন্থে ও সম্বন্ধে এতটুকুও ইঙ্গিত করেন নাই।

বোপদেবের কৃতিত্বে সাহিত্যশাস্ত্রও উজ্জীবিত হয়েছে এমন সংবাদ হেমাদ্রি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি সাহিত্যের কোন্ দিকটি অর্থাৎ অলংকার, কাব্য, রীতি ধ্বনি প্রভৃতি কোন অঙ্গটিকে পল্লবিত

করেছে সেসম্বন্ধে মুদ্রিত আকারে কোন গ্রন্থ, দেখা যায় না।

তবে তিনি যে রস ও অলংকার শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহ। কারণ, অপ্রাকৃত রসময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিষ্ণুর সভেদতত্ব স্থাপনায় শ্রীমদ ভাগবত পুরাণ যে ভারতের অন্যতম বৈষ্ণবগ্রন্থ, তারই বক্তব্য এবং মর্মবাদটিকে তিনিই প্রথমে রস বিভেদ ক্রমে নূতন দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

শ্রীমদভাগবত অবলম্বন করে তিন খানি গ্রন্থ নির্মাণ করেছেন। এ সংবাদ দিয়েছেন "মুক্তাফল" নামে গ্রন্থের উপসংহারে। তিন খানি গ্রন্থের নাম পরমহংসপ্রিয়া, হরিলীলা ও মুক্তাফল।

প্রথমটি শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ষোড়শ শতকের শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রী সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামী তাঁদের শ্রীভাগবত টীকা ও ষট্‌সন্দর্ভের অন্যতম তত্ত্বসন্দর্ভে এবং শ্রী গোপাল ভট্ট গোস্বামী হরিভক্তি বিলাসের বহুস্থলে বোপদেবের ভাগবতটীকা পরমহংসপ্রিয়ার বহু পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ হরিলীলা। এটিকে এক কথায় বললে বলা যায় গ্রন্থটি ভাগবতেরই একখানি অনুক্রমণিকা।

এই অনুক্রমণিকার বক্তব্য অনুসরণ করে শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভ রচনা করেছেন। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যারা প্রতি সপ্তাহে সম্পূর্ণ ভাগবতের সার বস্তু পাঠ করতে চান তাঁদের জন্য এই হরিলীলা।

এ সমন্ধে শ্রী বোপদেব নিজেই বলেছেন হরিলীলায় "শ্রীমদ্‌ ভাগবতস্য অনুক্রমণিকাত্মকং হরিলীলামৃতং নাম শ্রীমদ্‌ভাগবত গূঢ় তত্ত্ব প্রতিবাদক প্রকরণম্‌ যত্র প্রথমং ভাগবতার্থং, তস্য হরিলীলাভিধায়িত্বং তত্র প্রমাণলক্ষণে চোপন্যস্য দ্বাদশসু স্কন্ধেষু প্রথমস্কন্ধে বক্তৃশ্রোতৃণাং, দ্বিতীয়ে শ্রবণ বিধেঃ, তৃতীয়ে সর্গস্য, চতুর্থে বিসর্গস্য পঞ্চমে স্থানস্য, ষষ্ঠে পোষণস্য, সপ্তমে উতেঃ, অষ্টমে মন্বন্তরস্য, নবমে ঈশানু কথায়াঃ, দশমে নিরোধস্য, একাদশে মুক্তেঃ, দ্বাদশে আশ্রয়স্য নিরূপণত্বমভিধায় প্রতিস্কন্ধ মধ্যায় প্রকরণ সন্ধ্যো নিরুচ্য প্রত্যাধ্যায়ং প্রতিপাদ্য নিরূপণঞ্চ সম্যক্‌সংন্যবেশি, অপিচ, শব্দতো হন্তরোহপ্যয়ং নিবন্ধ আয়াসমন্তরাহল্পীয়সা কালেন শ্রীমদ্‌ভাগবত তত্ত্বং জিজ্ঞাস্মানানাং অলস মতীনাং মনুজ সংহতীনাং সপ্তাহং বাচয়িতাং বিপশ্চিতাং চোপ কারাতিশয়ং হুনং অধ্যাস্যতীতি" অতএব হরিলীলা গ্রন্থটি হোলো সংক্ষেপিত শ্রীমদ্‌ভাগবত।

তৃতীয় গ্রন্থ মুক্তাফল। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৮০০টি শ্লোককে একত্র নিবন্ধ করে তারই নাম দিয়েছেন মুক্তাফল। কেন এই নাম? এ প্রশ্ন নিজেই তুলেছেন নিজেই উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের প্রসঙ্গটি নিজের নামে লেখেন নি। বন্ধু হেমাদ্রির নামে যে টীকাটি তাতেই অমনি রীতি অবলম্বন করেছেন।

নিজে বলেছেন শ্রীভাগবত যেন শুক্তি, আর তাতে ভক্তির উদয় হলেই সেটি হবে স্বাতী নক্ষত্রের জল, তারপরেই মুক্তাফলের জন্ম হবে যেমন হয়েছিল মার্কণ্ডেয় মুনির বিষ্ণুমায়া দর্শনের ফল বালক বিষ্ণুর দর্শনে। অথবা, যারা ব্রতাদি করে শুদ্ধ চিত্ত মুক্ত প্রায় হয়েছেন, তাঁরা এই ভাগবতের কাছে ফল লাভ তক এর সেবা করবেন।

মুক্তাফলেন গ্রন্থেন সদ্‌ভাগবত শুক্তিনা।
ভক্তিস্বাত্য দ্বুনা মুগ্ধ মার্কেণ্ডয় শিশুশ্রিয়া॥

এ গ্রন্থের প্রারম্ভে ৫টি এবং উপসংহারে ৬টি শ্লোক বোপদেবেরই রচিত। মুক্তাফল বা ভাগবতীয় সম্পুটটিতে বোপদেব দেখাতে চেয়েছেন ভাগবতের মূলত বক্তব্য উপাস্য, সমাধনোপাপ্তি, এবং উপাসক নির্ণয়। এই তিনটি মুখ্য বিষয়কে আবার চারটি প্রকরণের দ্বারা বিভক্ত করেছেন। অর্থাৎ বিষ্ণু প্রকরণ, বিষ্ণুভক্তি প্রকরণ, বিষ্ণুভক্ত্যঙ্গ প্রকরণ এবং বিষ্ণুভক্ত প্রকরণ।

উপাস্য প্রকরণে দেখিয়েছেন বিষ্ণুই সর্বাদি তত্ত্বময়। তিনিই নিরাকার তিনিই সাকার। সর্বপ্রকার অবচ্ছেদক মুক্ত চৈতন্যই নিরাকার, আবার তিনিই সত্ত্ব রজ তমো গুণের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হয়ে সাকার। যখন সত্ত্ব রজ তম গুণময় তখন তিনি পুরুষ। শুধু রজ প্রধান গুণময় যখন তখন ব্রহ্ম। তম প্রধান হলে রুদ্র, আর সত্ত্ব প্রধান হলেই তিনি গুণময় বিষ্ণু। তাই অগোচর হয়েও যখন গোচরী ভূত হন, তখন প্রকৃতির সেই সত্ত্ব গুণময় পুরুষ বিষ্ণু। এমনি অন্যান্য পুরুষগণ এক একটি গুণের দ্বারা গোচরী ভূত হন।

এই সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য করার জন্য ভাগবতের ১০।৩।২০ শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়াছেন—

সত্বং ত্রিলোক স্থিতয়ে স্বমায়য়া
বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সগায় রক্তং রজসোপ বৃংহিতং
কৃষ্ণং চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥

এই সিদ্ধান্তের দ্বারা বোপদেব প্রমাণ করতে ছেয়েছেন বিষ্ণুই ত্রিবিক্রম, আর ত্রিবিক্রম স্বরূপই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই আবার অবতার ভেদে কৃষ্ণ মূর্তি।

তস্মাৎ কলিযুগে বিপ্রা নান্যত্র প্রাপ্যাত হরিঃ।
যদি কার্য্যংহি কৃষ্ণেন তত্র গচ্ছত মা চিরম্‌।
কারণ— আদৌ ত্রিবিক্রম ইতি খ্যাতি রাসীৎ মহীতলে।
কৃষ্ণস্তু কলান্যাসাৎ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তো॥

সার কথা নারায়ণ, বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম ও কৃষ্ণ এগুলি আদি পুরুষের নাম। তিনিই স্ব-অংশে আবিষ্ট হয়ে লীলাকর কৃষ্ণ হন।

বিষ্ণু ও কৃষ্ণ অভেদ। যেখানে যেখানে বিষ্ণু স্মরণ বিষ্ণুপাসনা, বিষ্ণুলীলা সেই সবই কৃষ্ণপর। এই ভাগবতে বিষ্ণু কৃষ্ণ অভেদ জ্ঞানের প্রকাশ। যেগুলি রসময়ী ফল, সেগুলি বিষ্ণুময়ী বা কৃষ্ণময়ী। বিষ্ণুর বা কৃষ্ণের রসময়ী লীলাটি প্রকৃতি গুণময় কৃষ্ণের সাকার রূপের আচরণ হয়েই সেটি অপ্রাকৃত চৈতন্যময় বিষ্ণু কৃষ্ণেরলীলা।

অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং বিষ্ণুকীর্তন অভিন্ন। নর বিড়ম্বনা এই লীলা। যেহেতু এটি নরাকৃতি বিষ্ণু কৃষ্ণলীলা।

স্মরন্ত কীর্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনন্‌।১১।৬।৪৯।

এইভাবে বিষ্ণু-কৃষ্ণ অভেদ হয়েও নরাকৃতি কৃষ্ণের প্রকৃতিময়ী লীলাটিতে বিপ্রলম্ভাশৃঙ্গার রস, হাস্যরস, করুণ রস, ভয়ানক রস, বীভৎসরস, শান্তরস, অদ্ভুতরস, বীররস, প্রভৃতির প্রাকট্য হয়। বিষ্ণু উপাসকগণ এই জন্যই কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করে মুক্ত হন।

বোপদেব দেখিয়েছেন ভাগবত গ্রন্থের বক্তব্যই হল মুক্তিপরতন্ত্রতা নিয়ে, কারণ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারটির ঊর্দ্ধে অন্য কোন তত্ত্ব নাই। চতুর্থ-তত্ত্ব মোক্ষ বা মুক্তি। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তি নরলোকবৎ লীলাকারী নারায়ণ-কৃষ্ণের এই মর্ত্যলীলা এবং সাধনোপাত্তি শ্রবণ মননাদি করে মুক্ত হবেন। এ বিষয়ে বোপদেব ভক্তের ভক্তির প্রকার ভেদকে নয় ভাগে আবদ্ধ করেছেন, এবং বলেছেন—

'ব্যাসাদিভি র্বণিতস্য বিষ্ণো বিষ্ণু ভক্তানাং বা চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্য শ্রবণাদিনা জনিতশ্চমৎকারো ভক্তিরস:' (মুক্তাফল বিষ্ণভক্ত প্রকরণ)

বোপদেবের প্রদর্শিত ভাগবতবাদটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত শ্রীচৈতন্যদেবের অনুবর্তি শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব প্রভৃতি সম্যক্ গ্রহণ করেন নাই। তাঁরা তাঁদের রচিত সন্দর্ভাদির দ্বারা দেখিয়েছেন নরলোকবৎ লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণই আদিতম পুরুষ ভগবান, বিষ্ণু নারায়ণ প্রভৃতি অংশাবতার। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবাদ শ্রবণ মনন করলে হৃদয়ে যে ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়, তার দ্বারা জীবের মুক্তি হয় না, অকৈতব প্রেমলাভ হয়, সে প্রেম পঞ্চম পুরষার্থ। চতুঃপুরুষার্থ মুক্তির ঊর্দ্ধে। মুক্তির দ্বারা জীব ঈশ্বরে অভেদ এই সিদ্ধান্ত অ-সম্যক্‌জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপরতত্ত্ব লাভ করলে জীব নির্মুক্ত তো হবেই, তাছাড়া হবে চিন্ময় ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার আস্বাদক এবং ভাবোচিত দেহলাভ।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভাগবতীয় লীলাবাদ খুবই অভিনব। একাদশ শতাব্দীর শ্রীরামানুজ তাঁর দার্শনিক গ্রন্থাবলিতে বিষ্ণুপুরাণের বিষ্ণুপরনিষ্ঠ বৈষ্ণব মতবাদই গ্রহণ করেছেন কিন্তু ভাগবতীয় নয়। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুদৈবতাক কোনও সিদ্ধান্তও গ্রহণ নাই। এই জন্যই অনেকের অভিমত ভাগবত গ্রন্থটির মৌলিক কাঠামো সংক্ষিপ্ত আকারে হয়তো বা ছিল, সেটি বিষ্ণুপুরাণেরই সিদ্ধান্তবাদ, কিন্তু পরে বোপদেবের দ্বারা বহুলাংশে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং 'পরুরাত্র' সংহিতার সিদ্ধান্তবাদকে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সঙ্গে যোজিত করা হয়েছে। যে দিক্ থেকেই যিনি যে অভিমত প্রকাশ করুন, কিন্তু একস্থানে এসে সকলেই একমত যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রীয় বৈদ্য ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব বোপদেব যে প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে প্রতিভা অদ্যাবধি আর কারোর মধ্যে প্রতিভাত হয় নাই। আর হেমাদ্রির মত এমন গুণগ্রাহী বিদ্বদ্ বন্ধুও কারোর সঙ্গে এমন একাত্মচিত্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

নবেন্দু সেন

'ইষ্টুপিড শুয়োর! আজ বাদে কাল এগজামিন—লেখা পড়া গেল, লব্ হচ্ছে?'…হতভাগা পাজি নচ্ছার হনুমান! লবে পড়া হয়েছে! মঙ্গভূমি হয়ে যাবে? এতকথা শিখলে কোথা তাই ভাবি!… পড়াশুনোর নাম নেই! খাবি কি এর পরে?…যতদিন বেঁচে আছি ততদিন মন দিয়ে পড়ে শুনে নিজের কায কিনে নে—তা নয় 'লবে' পড়েছেন ছেলে আমার!……ফের যদি ওসব পাগলামি শুনতে পাই ত জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে দেবো।'

অতঃপর মানিক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।'

এই সেই একদা বিখ্যাত 'প্রণয় পরিণামে'র নায়ক মানিক। স্কুলের ছেলে মানিকের প্রেমিকার সংবাদও গোপন ছিল না। 'এই কার্তিকে এগারোতে পড়েছে কুসুম।' নন্দচৌধুরী ডাক্তারের চিকিৎসায় নায়ক নায়িকার প্রেমের পরিণাম সকলের জানা আছে। স্নিগ্ধ, সরস হাসির গল্পের মধুর পরিণতিতে বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে সেদিন প্রণয় পরিণামের লেখকের পরিচয়ও বিস্তৃত ছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩)।

আজ থেকে একশ'দু বছর পূর্বে প্রভাতকুমার তাঁর মামার বাড়ী, বর্ধমান জেলার ধাত্রী গ্রামে জন্মেছিলেন। পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় রেলের চাকরী করতেন। ঝাঝা, দিলদার নগর, জামালপুর প্রভৃতি জায়গায় তাঁর কর্মস্থল ছিল। প্রভাতকুমার জামালপুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়তেন। সে সময় তাঁর অভিভাবক ছিলেন তাঁর মাসতুতো দাদা রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ওখান থেকেই দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯১-এ এফ্, এ, এবং ১৮৯৫-এ বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯৮—১৯০০ পর্যন্ত সিমলা ও কলকাতায় কেরাণীর কাজ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সরলা দেবীর সাহচর্যে এসে তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলেতে যাত্রা করেন ৩ জানুয়ারী ১৯০১-এ। কৃতকার্য হয়ে ফিরেছিলেন ১৯০৩-এ। ১৯০৪ থেকেই প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেন। প্রথমে দার্জিলিঙে, রঙপুরে; পরে ১৯০৮—১৬ পর্যন্ত গয়ায় প্র্যাকটিস করেন। প্রভাতকুমারের বয়স তখন তেতাল্লিশ। এই সময় তাঁর কর্মজীবনে একটা বড় পরিবর্তন এল। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ইচ্ছায় মানসী ও মর্মবাণী (১৯১৬ ফাল্গুন) পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কর্মভার গ্রহণ করেন। মহারাজার চেষ্টায় প্রভাতকুমার ঐ বৎসর ১লা আগষ্ট থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের অধ্যাপনার কাজও পান। প্রভাতকুমার এবার স্থায়ীভাবে কলকাতায় এলেন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর প্রভাতকুমার মানসী ও মর্মবাণীর সম্পাদনা করেন। ১৯২৮-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদেও তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। প্রভাতকুমারের মৃত্যু হয়েছিল ৫ এপ্রিল ১৯৩২। তাও বিয়াল্লিশ বৎসর হয়ে গেল। আজ তিনি প্রায় বিস্মৃত অতীত। পাঠক্রমের পৃষ্ঠায় যদি অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে বাধ্য হয়ে কারো কারো নাম ও কিছু

রচনার পরিচয় নিতে হয়। তা নাহলে আমরা সচরাচর ভুলতেই ভালবাসি কারণ ভুলতে পারাটা আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বিশেষত যে লেখকের আবির্ভাবের মধ্যে কড়া গলায় হৈ চৈ নেই, উদ্দাম উল্লাস নেই, ঝড়ো দমক নেই অথবা ষ্টাণ্ট ও ম্যামার ও নেই সে লেখককে বাঙালী পাঠক সমাজ বেশীদিন ধরে রাখতে চান না। প্রভাতকুমারের গল্প, উপন্যাসে সে ষ্টাণ্ট ও ম্যামার ছিল না। কড়া গলার উদ্দাম উল্লাসও ছিল না। সেসব মাধুর্য, কখনো কখনো নগ্ন বেদনার ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছিল তার লেখাগুলি। ফলত প্রভাতকুমার অতি সহজেই হারিয়ে যেতে পেরেছেন। চলচ্চিত্রায়নে ধরে রাখার প্রয়াসও কুশলী শিল্পী করেছিলেন কিন্তু ('দেবী') তারও সীমানা নির্দিষ্ট। অথচ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যবর্তী কোন ঔপন্যাসিকের নাম করতে হলে প্রভাতকুমারের নামই প্রথম উচ্চার্য। কেবল তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রভাতকুমারের রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সেগুলি সম্পর্কে সপ্রশংস মনোভাব পোষণ করতেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উল্লেখ করা গেল।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

তোমার গল্পের বই দুটি [দ্বিতীয় সংস্করণের 'নবকথা' ও 'ষোড়শী'] এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। মনে ভাবিলাম সব গল্পই তো পূর্বে পড়া হইয়াছে—ইহা আর পড়িব কি? অন্যান্য সাধারণ লোকের মতো অপূর্বের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে। সময়টা তখন সন্ধ্যা, হাতে কাজ ছিল না তাই নিতান্তই অলসভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে সুরু করিলাম—দেখিতে দেখিতে মনটা আটকা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোটগল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্য্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মত—গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই সেটা বিষম ভারি—তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে, বুকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে না। যাহা হউক, তোমার প্রথম সংস্করণের পাঠকেরা দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ভীড় করিয়া দাঁড়াইবে, নিজের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ইতি—১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বহুজনের সাহিত্যিক কীর্তির অকপট প্রশংসা করেছেন। মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে সেগুলির গুরুত্ব সর্বদা দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রভাতকুমারের গল্পগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির বক্তব্য স্বতন্ত্র। গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাতকুমারের মন রাখবার জন্যে, সৌজন্যমূলক চিঠি এটা নয়। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুলি একবার পড়া সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার পড়েছেন; এবং তা কেবল সময় কাটানোর জন্যে নয়। গল্পগুলি দ্বিতীয়বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করেছেন। 'ভারি ভাল'। 'কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোটগল্পের লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মত।' গল্পগুলি তার 'মনে আটকা' পড়েছিল। এটা খুব ছোট সংবাদ

নয়। গল্পগুলি দ্বিতীয়বার পড়েও 'নূতন করে আবিষ্কার' করা এবং 'মনে আটকা পড়ার মত। এবং পাঠক রবীন্দ্রনাথ। কল্পনা ও হাসির পাশে তীব্রগতিসম্পন্ন। সূর্যরশ্মির মত উজ্জ্বল। তীক্ষ্ণ বাণের মত হৃদয়-বিদ্ধ। এ-মূল্যবিচার সার্টিফিকেট নয়। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি।

অধিকাংশ লেখক জীবনের সূত্রপাতের মত প্রভাতকুমারের সাহিত্যিকজীবনেরও শুরু হয়েছিল কবিতা দিয়ে। যদিও গল্প, কবিতা, উপন্যাস, গ্রন্থ সমালোচনা সবই তাঁর রচনার ভাণ্ডারে ছিল। তাঁর প্রথম সাহিত্যরচনা সতের বৎসর বয়সে, ১৮৯০'র কার্তিক সংখ্যার 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'চিরনব' নামক একটি কবিতা। মাত্রাবৃত্ত প্রকৃতিতে সাত মাত্রাভাগে বিরচিত কবিতাটির ১৮টি স্তবক এবং ৩৬টি পদ আছে। প্রকৃতি স্রষ্টার সৃষ্টি। তাতে বিস্ময় ও মহিমা বর্তমান। কবিতায় সেই সৃষ্টির বর্ণনা এবং শেষ চরণে স্রষ্টার প্রতি বিনম্র প্রণাম জানানো হয়েছে। একটু উদাহরণ।

(১৩)	(১৪)
চাঁদের ক্ষীণ আলো	প্রকৃতি, এই গান
ধরণী গায়ে মাখা,	শিথিল কাছে যাঁর
নিখিল চরাচর	তাহার পায়ে কবি
ফুলের কোলে রাখা।	প্রণমে বার বার।

এটি কোন মহৎ কবিতা নয়। ভাব গভীরতায়, কাব্যের প্রকরণে উচ্চ গ্রামের কোন সৃষ্টি নয়। কিন্তু ১৮৯০'র সপ্তদশ বর্ষীয় এক কিশোরের সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত রূপে এ কবিতার সরলতা ও ছন্দবোধ অবশ্যই প্রশংসনীয়। প্রভাতকুমার তাঁর কাব্যচর্চার সূত্রপাত প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সে বোধহয় ১৮৯৬ সালের কথা। আমি তখন কবিযশঃ প্রার্থী নব্য যুবক। মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে আমার দুই একটা কবিতা বাহির হয়।..... । সে বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দিন মাথায় এক খেয়াল উঠল। একটা পাত্রে খানিকটা খুন খারাপের রঙ গুলিয়া খানকতক পোষ্টকার্ড তাহাতে বেশ করিয়া ভিজাইয়া লইলাম। ..... । পোষ্টকার্ডগুলি শুকাইলে, এক একখানিতে এক একজন বড় সাহিত্যিকের নাম ও ঠিকানা লিখিলাম। ভিতরে নববর্ষের অভিবাদন সূচক দুই লাইন কবিতা—তাহা প্রত্যেক সাহিত্যিকের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছিলাম।"

প্রভাতকুমারের কবিতার সংখ্যা নিতান্ত একটি দুটি নয়। ১৮৯০-৯৯ পর্যন্ত ন বৎসর ধরে তিনি কবিতা লিখেছেন। এগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন চিরনব, ১৮৯০'র 'ভারতীয় ও বালকে' কার্তিক সংখ্যায়, 'অবসান' ও 'অভিশাপ' ভারতীর ১৮৯৬ ও ১৮৯৯'র ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায়, অতিথি, শেষদান, মহাযাত্রা, কামনা ১৮৯৬'র দাসী পত্রিকায় যথাক্রমে মে, জুন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৭'র প্রদীপ মাসিকে মীরাবাঈ, 'হোলি কাহিনী' কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮'র প্রদীপের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রাহায়ণ, পৌষ, মাস সংখ্যায় যথাক্রমে আকাশ কেন নীল, প্রেমের সৌরভ, অনন্ত শয্যা, একটি প্রার্থনা, অকাল মৃত্যু, উদ্বোধন, তার নাম কবিতাগুলি ছাপা হয়। ১৮৯৯'এ ঐ একই পত্রিকায় বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যায় 'পরলোক তত্ত্ব' এবং 'নামলেখা' কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের গল্পগুলির গুণ সম্পর্কে লিখেছিলেন ; কিন্তু তাঁর কবিতা সম্পর্কে তেমন কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। কিন্তু 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'কবিতা অবসান' নামক কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায় যে 'মিলনান্তে' এবং 'বিরহান্তে' উপনামে যথাক্রমে প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি কবিতা একত্রে ছাপা হয়েছিল। দুটিই সনেটের আকারে। কিন্তু অষ্টক ও ষষ্ঠকের ভাগ নেই। ৮/৬ মাত্রা ভাগে অক্ষর বৃত্ত প্রকৃতির পয়ারবন্ধে রচিত। প্রভাতকুমারের কবিতাটির মিল-বিন্যাস কথ, কথ, গঘ, গঘ, ঙচ, চঙ, কক। রবীন্দ্রনাথের কক, থথ, গগ, ঘঘ, ঙঙ, ঘঘ, চচ। প্রভাতকুমারের কবিতায় মিলনান্তের আকণ্ঠ মদিরা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিরহের অতলান্ত বিষাদ। মিলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রভাতকুমারের চেতনালুপ্তির কথা প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিরহের তীব্র মুহূর্তেও মিলনের ধ্বনি শ্রুত হয়েছে। কিন্তু বস্তু বিগলিত ভাব সৌন্দর্যের নিবিড়তায় জগৎ ও জীবন চিন্তার কোন গভীর রহস্য বোধ প্রভাতকুমারের কবিতায় স্থান পায় নি। 'পরলোক তত্ত্ব' কবিতায় প্রভাতকুমার লিখেছেন,—

"আমরা পৃথিবী ছাড়ি চলিয়া যে আসি,—
যত কিছু সেথাকার
দেহ ও বাসনাভার,
চিতানলে হয়ে হয়ে ভস্ম রাশি রাশি।
শুধু থাকে হেমবৎ প্রেম অবিনাশী।"

দেহাতীত প্রেমের কথা ব্যক্ত হলেও তা ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য নিবিড়তায় প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে চমেলীর লাবণ্যবিলাসের 'দেহহীন' সৌন্দর্যের ইশারা নেই। এ যেন Statement of facts'র মত। প্রভাতকুমারের কবিতায় একধরণের সহজ সারল্য আছে। একটা Intense emotion এ তার প্রকাশ ঋজু মৃথীন। প্রিয়া-মিলনের অনিরুদ্ধ মানসিকতায় কবি অনুভব করেছেন :—

'সহসা আশ্চর্য আমি যে ওগো'
হইলাম দুইকায়া।'

বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রভাতকুমারের কোন বিশিষ্ট স্থান না থাকলেও কথা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষত গল্পের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব নাম অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত। প্রায় শতাধিক গল্প তিনি লিখেছেন। রস ও বিষয় বস্তু অনুযায়ী তার গল্পগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।

ক) গার্হস্থ্য গল্প : রেলে কলিসন, বউচুরি, হিমানী, খালাস, চিরায়ুস্মতী, কলির মেয়ে, বাল্যবন্ধু, আমার উপন্যাস, বাস্তু শাপ, প্রভৃতি গল্প।

খ) ব্যঙ্গ গল্প : মাদুলি, ধর্মের কল, যুগল সাহিত্যিক, সচ্চরিত্র।

গ) ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্মের পটভূমিতে রচিত গল্প : ফুলের মূল্য, মাতৃহীনা।

ঙ) পত্ত গল্প : আদরিণী, কুকুরছানা।

চ) করুণ গল্প : দেবী, ফুলের মূল্য, মাতৃহীনা ও কাশি বাসিনী।

একমাত্র চ-শ্রেণীর গল্প ক'টি ব্যতীত প্রভাতকুমারের অধিকাংশ গল্পের পরিণতি সুখের। সহজ সুখের, সরল আনন্দের। 'বলবান জামাতা, 'বিলাত ফেরতের বিপদ, অথবা 'কুড়ানো মেয়ে, কোনো গল্পই

অব্যক্ত যন্ত্রণার কিম্বা গভীর বেদনার নয়। দৈহিক নির্যাতনের, স্থূল কষ্টও মিলনের উচ্চ হাস্যরোলে ডুবে গেছে। শুভ্র শারদীয় এক টুকরো মেঘের মতো। কোথাও বেদনার এতটুকু ভাব নেই। স্মিত কৌতুকের আলোয় উজ্জ্বল গল্পের পরিণতি। 'বলমান জামাতার' নাম ও শারীরিক অবস্থা নিয়ে শ্যালিকাদের ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে নলিনী শরীর চোখ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে সশ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে শ্যালিকাদের চমকে দিতে গিয়ে ডাকাত ভ্রমে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হলে তার বিপন্ন অবস্থা ও করুণ দুঃখের মুখের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি যত পড়ে তার চেয়ে তার ভাগ্য বিড়ম্বনার স্থূল কারণ দেখে হাসি পায় বেশী। হাসি খুশি একেবারে উপচে পড়ে গল্পের শেষে যেখানে নলিনী জামাতা রূপে গৃহীত হয়ে শ্বশুর বাড়ীর আদরে আপ্যায়নে একেবারে হাবুডাবু খাচ্ছে। অথবা সেই বিখ্যাত প্রণয় পরিণাম গল্পটি অথবা 'সচ্চরিত্র'! নলিনীকে সুরেন ভালবাসল কিন্তু যেদিন নলিনী সুরেনের আশ্রয় চাইল সেদিন সুরেনের নৈতিক বোধ প্রবল হয়ে উঠল। ভ্রষ্টা নারীর মেয়ে যতই অপাপ বিদ্ধ হোক না কেন সে সামাজিক সম্মানের অধিকারী হতে পারে না। সুরেন কলকাতা থেকে পালিয়ে নলিনীকে এড়িয়ে চরিত্রবান যুবক হয়ে উঠল। এ গল্পে লেখকের ব্যঙ্গ বোধও বেশ স্পষ্ট। গল্পের পরিণাম জোর করে মধুর করতে গিয়ে গল্পের গঠনে ও রস নিষ্পত্তিতে কলাবোধের অভাব ও প্রভাতকুমারের রচনায় লক্ষিত হয়। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। যেমন 'পুলিন বাবুর পুত্র লাভ' গল্পটি। পুলিন বাবুর বন্ধ্যা স্ত্রী সুশীলা। স্ত্রীর এবং পরিচিতদের পৌন পৌনিক অনুরোধে, পুলিন বাবু যেন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে বংশ-রক্ষা করেন। পুলিন বাবুও সুশীলাকে ত্যাগ করে বংশ রক্ষা করতে চান না। অবশেষে স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা করে অভিনেত্রীর ফটো দেখিয়ে তাঁকে পুলিন বাবু বিয়ে করতে চান বললে সুশীলা বাপের বাড়ী চলে যান। গল্পের এবার পরিণতি। কিন্তু লেখক মধুর পরিণতিতে বিশ্বাসী। অতএব সুশীলাকে ঠাট্টাটা বুঝিয়েও সুশীলার পুত্র সন্তান লাভে পুলিন বাবুকে বংশ রক্ষা করে সুখে দিন কাটাতে দিয়েছেন। এই সুখই প্রভাতকুমারের গল্পের দোষ ও বৈশিষ্ট্য। মাতৃহীনা, দেবী, অথবা কাশি বাসিনীর কারুণ্য প্রভাতকুমারের গল্পরাশির কয়েকটি ব্যতিক্রম মাত্র।

কিন্তু একটি বিশেষ ব্যতিক্রম, সম্ভবত বিশিষ্টতম ব্যতিক্রম মাতৃহীন গল্পটি। মিস্ মড্ আর চারুচন্দ্র দত্তের ঘনিষ্ঠতা ইংলণ্ডের স্বাধীন মেলামেশার পটভূমিতে যখন বিয়ের পর্যায়ে এল তখন পাত্রের পিতা ভারতবর্ষ থেকে সোজা ইংলণ্ডে গিয়ে মডের বাবা, মা'র পা জড়িয়ে ধরে বললেন,

"আমায় ক্ষমা করুন। আমার ঐ একমাত্র পুত্র। আমাদের বুড়োবুড়ির একমাত্র অবলম্বন।"

মড্‌কে বিয়ে করলে জাতিচ্যুত হবে, মৃত্যুর সময় পুত্র হস্তের গঙ্গাজলও জুটবে না। মডের পিতা মাতা বিষয়টির বিবেচনার ভার প্রাপ্ত বয়স্ক পাত্র, পাত্রীর হাতে ছেড়ে দিলেন। চারু পিতা মাতার অমতেই মড্‌কে বিয়ে করবে স্থির করল। কিন্তু "মড্ বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল এমন অবস্থায় আমি কখনই চারুকে বিবাহ করিব না।" চারুকে তার বৃদ্ধ পিতা মাতার হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিতে পারল না। চারুর প্রতি তার ভালবাসার জন্যেই সে চারুকে মুক্তি দিল। আর সারা জীবন সে তার কৌমার্য নিয়ে বসে রইল পরপারে চারুর সঙ্গে মিলনের আশায়। ভারতবর্ষ থেকে আনানো চুরি দু'গাছা পরে সে বিবাহিত জীবনের কায়নিক মানসিক সুখ পেত। যেদিন চারুর মৃত্যু সংবাদ এল

"সেই দিন সে হাতের চুড়িগুলি খুলিয়া ফেলিল। সে শুনিয়াছিল, হিন্দু বধূ বিধবা হইলে হাতে আর চুড়ি পরে না।"

গল্পের শেষ আরো করুণ, আরো চমকপ্রদ। বহুদিন কেটে গেছে। মড্ ব্রিটিশ মিউজিয়মে ক্যাম্বেল নামে পরিচিত এখন। ক্যাম্বেল অসুস্থ হয়ে পড়লে একদিন তার শোয়ার ঘরে শুইয়ে দিতে গিয়ে পরিচিত ভারতীয় যুবকটি চমকে ওঠেন। মডের শয়ন কক্ষে তার পিতার তরুণ বয়সের ছবি টাঙানো রয়েছে। যুবক সব বুঝলেন।—তারপর এই যুবকেরও বিয়ে হয়েছে। পুত্র হয়েছে। মিস্ ক্যাম্বেল বার বার লেখেন একবার আসতে। একবার পূজার ছুটিতে এরা যাবে বলে চিঠি দিলেন। প্রায় দেড় মাস বাদে "মালিক মৃত, পত্র বিলি হইল না।" বলে সে চিঠি ফেরৎ এল।

প্রভাতকুমারের এই গল্পগুলিতে ছোট গল্পের ভূগোল বিস্তৃত হয়েছে। ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ইয়োরোপেও গেছে। উভয় দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানবতার জগতে দেশে জাতিতে দূরত্ব কমে যায়—এই সত্যটি প্রভাতকুমারের বিদেশী পটভূমিকায় লিখিত গল্পগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রভাতের অনুসরণও পরবর্তী ছোটগল্পে লক্ষিত হয়।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দ। রমাসুন্দরী (১৯০৮), নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২), রত্নদ্বীপ (১৯১৫), জীবনের মূল্য (১৯১৭), সিন্দুর কৌটা (১৯১৯), মনের মানুষ (১৯২২), আহুতি (১৯২৪), সত্যবালা (১৯২৫), মুখের মিলন (১৯২৭), সতীর প্রতি (১৯২৮), প্রতিমা (১৯২৮) গরীব স্বামী (১৯৩০), নবদুর্গা (১৯৩০), এবং বিদায় বাণী (১৯৩৩)। 'রমাসুন্দরী' ভারতী পত্রিকায় (১৯০২) কেবল 'সুন্দরী' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসটি সে কালে খুব জনপ্রিয় এবং সোরগোল সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসটির গঠনরীতি নিয়ে সমালোচনাও হয়েছিল। প্রবাসী'তে এ সম্বন্ধে যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, লেখক নিজে তার জবাব লিখেছিলেন।

'প্রবাসীর সমালোচক, নবীন সন্ন্যাসীর সমালোচনায় একটু ভুল করিয়াছেন। তাহার প্রধান অভিযোগ এই যে, নবীন সন্ন্যাসীতে unity of action-এর অভাব আছে—লিখিয়াছেন কোন চরিত্রই কেন্দ্রগভাব বা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ফুলের বীজকোষের পাশে পাপড়ির মত ফুটিয়া উঠে নাই। এখন এই unity of action জিনিষটি নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ—উপন্যাসের নয়। তবে যে সকল উপন্যাস নাটক লক্ষণাক্রান্ত, যেমন বঙ্কিমবাবুর—সেগুলিতে unity of action দেখা যায় বটে। কিন্তু আরো একশ্রেণীর উপন্যাস আছে—তাহা চিত্রজাতীয় বলা যাইতে পারে। Dickens-এর উপন্যাসগুলিই এ জাতীয় উপন্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার প্লট ও ঘোরান হয় না– বীজকোষ সম্পত্তিরও কোনও হাঙ্গামা নাই। আমার নবীন সন্ন্যাসীও সেইরূপ চিত্রজাতীয় উপন্যাস।'

উপন্যাসটি দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লেখকের সকৌতুক ব্যঙ্গপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয় 'বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা' অথবা Society for the propagation of electrical Hinduism ; এই সভার সভ্যরা বিশ্বাস করেন,

'……ইলেকট্রিসিটি আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি বা ফোর্স। পূর্বকালে যাহাকে ব্রহ্মতেজ বলিত তাহা বিদ্যুৎ ভিন্ন কিছুই নহে। মানুষের আত্মা খানিকটা বিদ্যুৎ। পূজা হোম জপতপ

করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। হিন্দুর ক্রিয়া কর্মগুলি বিদ্যুৎ বাড়াইবার কৌশলমাত্র। হিন্দুর পক্ষে যে সকল খাদ্য নিষিদ্ধ, তাহা খাইলে আত্মার বিদ্যুৎহানি হয় এই কারণে নিষিদ্ধ।'

'নবীন সন্ন্যাসী'র প্রধান আকর্ষণ 'গদাই চরিত্র'। বাংলা সাহিত্যে 'ভাদুদত্ত', 'ঠকচাচা' যেমন অমর তেমনি 'গদাই পাল'ও অবিস্মরণীয়। শঠতায়, নীচ মনোবৃত্তিতে, স্বার্থসিদ্ধিতে সে নিপুণ। কিন্তু উপন্যাসের মূল কাহিনী ও অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে তার সম্পৃক্তি সব সময় যৌক্তিক নয়। কিন্তু চক্রান্তজাল বিস্তারে, লোকচরিত্র বিচারে গদাই পাল একক।

প্রভাতকুমারের অন্যতম বড় দুটি উপন্যাস 'রত্নদ্বীপ' ও 'সিন্দুর কৌটা'। রত্নদ্বীপের বক্তব্য বস্তু রাখাল ষ্টেশন মাষ্টারের জাল জমিদার পুত্র সেজে বিষয় সম্পত্তি অধিকারের প্রয়াস। ঘটনাগত জটিলতা ছাপিয়ে রাখালের প্রণয় ও বৌরাণীর পাতিব্রত্য ও পুত জীবনরসের আকর্ষণই প্রবল হয়ে ওঠে। বৌরাণীর জীবনের মাটিতে হিন্দু-বিধবার শিকড় শক্ত হয়েছিল। চরিত্রটির প্রতি সবল মমতাবোধ ও সহানুভূতি এই কারণেই লক্ষিত হয়। contrast character রূপে খগেন ও কনককে মনে পড়ে। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এবং লালসা চরিতার্থে শিথিল চরিত্র তারা।

বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও 'সিন্দুর কৌটা' ও লেখকের কৌতুকপ্রিয়তায় বিনষ্ট হয়েছে। স্ত্রী বর্তমানে বিজয় সুশীর প্রেমে মুগ্ধ হয়েছে। passive character হয়ে স্ত্রী, বকুরাণী সে প্রেমের ইন্ধনই জুগিয়েছে। উপন্যাসের একটা main character passive আচরণ করে কি? না। কিন্তু লেখক এখানে তাই করিয়েছেন। ফলত বুকরাণীর মহিমাও তাতে বাড়ে নি, উপন্যাস অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। স্ত্রীর প্রতি পাল সাহেবের ব্যবহার দাম্পত্যজীবনাদর্শে আঘাত হেনেছে ঠিকই কিন্তু প্রেমেরদেহে দেহবোধের স্থান আছে এবং বিদেশে তার বড় স্থান দেওয়া হয়,—এটা বোঝা গেছে। কিন্তু সমস্ত উপন্যাসের পরিণতিই লেখকের কৌতুকপ্রিয় হালকা মানসিকতায় বেদনার সৌন্দর্যে জীবনের গভীরতর রহস্য ব্যাখ্যায় রসনিবিড়, শিল্পরূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। প্রত্যাশার অভাব প্রকট হয়েছে।

তবে প্রভাতকুমার একজন প্রথমশ্রেণীর উজ্জ্বল লেখক না হতে পারেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যবর্তী মধ্যমলয়ের একজন স্নিগ্ধ, সার্থক শিল্পী নিঃসন্দেহে। জীবনের অতলান্ত রহস্যের ডুবুরী হয়ত নন, কিন্তু জগৎ ও জীবনের সঙ্গে হাল্কা, কৌতুক-স্নিগ্ধ, সহজ সম্পর্ক তাঁর মানসিকতার সঙ্গে ছিল। শরৎচন্দ্রের sentimental treatment-এ চোখের জলের লাবণ্য যেখানে একটু বেশী বলে ক্লান্তি আসে প্রভাতকুমার সেখানে কৌতুক মাধুর্যে নরম আলোর ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন। জীবনে যন্ত্রণা তো আছেই। কিন্তু তার মধ্যেও একটু হাসির রৌদ্রালোক সৃষ্টি করতে পারায় কৃতিত্ব কম কোথায়। প্রভাতকুমার সেদিক থেকে প্রকৃতই প্রভাতের লেখক। সূর্য চন্দ্রের পাশে ভোরের নরম আলোটি।

ঋগ্বেদে কৃষিবিজ্ঞানের পরিচয়

অমিয়কুমার মজুমদার

কৃষির প্রতি বৈদিক ঋষিদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল। কৃষি-শিল্পাদি দেশহিতকর কাজও বৈদিক ঋষিরা স্তোত্র-প্রার্থনাদিযোগে যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সাহায্যে আরম্ভ করতেন। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে দেখি গৌতমপুত্র ঋষি বামদেব প্রার্থনা করছেন, 'শুনং বাহা শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলং। শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয়। অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা···শুনং ন ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভিষন্তু বাহৈঃ। শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং।' হে দেব ইন্দ্রবায়ু (শুনাসীরা), বাহক বলীবর্দ-সমূহ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে কার্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হোক, প্রতোদ তুমি সুখ প্রদানের জন্য চালনা কর। হে সৌভাগ্যদাত্রী সীতে (লাঙ্গলখনিত রেখা), তুমি অনুকূল হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করছি, তুমি আমাদের সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর। ইন্দ্রদেব সীতাকে (বা লাঙ্গলাধার কাষ্ঠ) গ্রহণ করুন, পুষাদেব তা চালনা করুন, তিনি জলবতী হয়ে বছরের পর বছর শস্য দোহন করুন। লাঙ্গলের ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, কর্ষকেরা সুখে বলীবর্দের সঙ্গে থাক, পর্জন্যদেবও সুখে মধুর রসযুক্ত জলধারা ক্ষেত্রসমূহে সিঞ্চন করুন। হে শুন, সীর, আমাদের সুখ প্রদান কর।

৫৭ সূক্ত থেকে জানা যায়, সেকালে গরু ও ঘোড়া উভয় জন্তুর সাহায্যেই কৃষিকাজ করা হত। ৪।৫৭।১ শ্লোকে বলা হয়েছে, আমরা বন্ধুসদৃশ ক্ষেত্রপতির সঙ্গে ক্ষেত্র জয় করব, তিনি আমাদের গরু ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন। চাষের বলদ বা ঘোড়া যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হয় তাহলে তাদের সাহায্যে উত্তম কর্ষণ সম্ভব হবে না তা তাঁরা জানতেন। শুধু তাই নয়, কৃষিকর্মের অতি প্রয়োজনীয় হল জল। তাই ঋষি প্রার্থনা করছেন, হে ক্ষেত্রপতি, ধেনু যেমন দুগ্ধ প্রদান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃততুল্য, মাধুর্যোপেত ও প্রভূত জল দান কর (৪।৫৭।২)॥

ঋগ্বেদের সময়ে আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি এবং পশুপালন। প্রথমাবধিই বৈদিক আর্যদের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল ধান ও যব। 'ধান্য' শব্দটি ঋগ্বেদের ৫।৫৩।১৩; ৫।১৩।৪; ১০।৯৪।১৩ সূত্রে এবং 'ধান' শব্দ ১।১৬।২, ৩।৩৫।৩; ৩।৫২।৫; ৬।২৯।৪ সূত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। ধান্য বা ধান শব্দ যেমন প্রচলিত শস্য সম্পর্কে প্রযোজ্য হত, তেমনি অন্যান্য শস্যবীজকেও ঐ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হত। তবে ধান ও যব প্রধান কৃষিদ্রব্য ছিল। বার্লি বা যব বসন্ত ঋতুতে পাওয়া যায়, শীত ঋতুতে বীজ বপন করা হয়। যব চাষে বেশী জলের প্রয়োজন হয় না, তাই শীতে বীজ বপন করলেও অসুবিধে হয় না। শীতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হলেই যব ফসলের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ধান চাষের জন্যে চাই যথেষ্ট বৃষ্টিপাত। আর্যদের প্রধান আহার্য ধান হওয়াতে এই শস্য চাষের বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। ধান চাষের জন্যে নিয়মিত বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন বলে আর্যরা বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নানা স্তব-স্তুতি করতেন।

পাঞ্জাব অঞ্চলে যে সব আর্যরা বসবাস করতেন তাঁরা জলের জন্যে নির্ভর করতেন হিমালয় থেকে উদ্ভূত নদীগুলির উপরে। হিমানী সম্প্রপাত এদের উৎস হওয়াতে প্রায় সারা বছর নদী থেকে পানীয় ও অন্যান্য কাজের জন্যে জল সংগ্রহ করতেন। যারা নদীর তীর থেকে অনেক দূরে থাকতেন তাঁরা কূপ খনন করে পানীয় জল সংগ্রহ করতেন। ঋগ্বেদের যুগে পাঞ্জাব অঞ্চলকে বলা হত সপ্তসিন্ধু। তখন তার দক্ষিণে, পূবে ও পশ্চিমে ছিল অতলান্ত সমুদ্র। তাই সহজেই অনুমান করা চলে যে সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অভাব হত না। পূব ও দক্ষিণ দিকের সমুদ্র বর্তমানে ঐ অঞ্চল থেকে বহু দূরে সরে গেছে। সেকালে বৃষ্টিপাতের অভাব হত না বলে পঞ্জাব ও সন্নিহিত অঞ্চলে ধান, যব ইত্যাদির চাষ খুব ভাল হত।

আর্যরা বৃত্রকে ধ্বংসের জন্যে ইন্দ্রকে স্তুতি করতেন বলে খ্যাত আছে। বৃত্র হলো শুষ্ক বা অনাবৃষ্টিরূপী অসুর। তাকে বাধা দিতে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে প্রায়ই বজ্র সহ বৃষ্টিপাত হতো। বৃষ্টিপাতের আধিক্যের কারণ আগেই বলা হয়েছে। বর্ষার সময় ভারতের প্রধান শস্য হলো ধান। ঋগ্বেদের আর্যরা যে ধান থেকে চাল তৈরী করতে জানতেন একথা বলাবাহুল্য মাত্র।

বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু, সূর্যদেব বা রুদ্র। ইনি সমুদ্র জলকে উত্তপ্ত করে বাষ্পে পরিণত করতেন। তারপর সেই বাষ্পকে ঊর্ধ্বাকাশে চালনা করতেন তাঁরা বা তিনি। ঋগ্বেদের ৮ মণ্ডলের ৭৭।১০ সূত্রে আছে—হে ইন্দ্র, তোমার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তা প্রদান করেছেন। তিনি ঊরুগতিবিশিষ্ট ও তোমার দ্বারা প্রেরিত। মরুৎ বা বায়ু (মৌসুমী বায়ু) সমুদ্র, জলাশয় থেকে 'জল বাষ্প' সংগ্রহ করে বর্ষাঋতুর তৃতীয় মাসে অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ করায়।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে। ঋগ্বেদের সময়ে সরস্বতী নদী প্রবলা বহতা ছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রাচীন বৈদিক আর্যদের অনেকে এই নদীর তীরাঞ্চলে বসবাস করতেন। তাঁরা ছিলেন মুখ্যতঃ কৃষিজীবী। বৃত্র বা অনাবৃষ্টিকে রোধ করতো সরস্বতী নদীর জলধারা। বিরাট নদীর প্রভাবে বৃষ্টিপাত যেমন হতো, তেমনি কৃষিক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের কাজে প্রধান সহায়ক ছিল সরস্বতী নদী। তাই তাঁরা সরস্বতীকেও ইন্দ্রের সমতুল্য মর্যাদা দিয়ে বলেছেন বৃত্রঘ্নী। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬১।৩—১৪ সূক্তে সরস্বতীর বন্দনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তুমি দেবনিন্দকগণকে বধ করেছ, মায়াবী বৃত্রকে নিধন করেছ। নদীতে চর ওঠে, নতুন বসতি হয়। তাই ঋষি সরস্বতীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তুমি মানবদের ভূমি প্রদান করেছ, তাদের জন্য বারিবর্ষণ করেছ (৬।৬১।৩)॥ কৃষিকাজের জন্যে জল একান্ত আবশ্যক, তাই সরস্বতী তীরস্থ আর্যরা বলেছেন, 'দানশালিনী, অন্নসম্পন্না, স্তোতৃবর্গের রক্ষণকারিণী সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যকরূপে আমাদের তৃপ্তি সাধন করেন।' (৬।৬১।৪)॥ বর্ণনা পড়ে মনে হয় তখন সরস্বতী নদীতে জলধারা ছিল অপরিমিত, স্রোত সঙ্কুটিলদীপ্ত, অপ্রতিহতগতি সম্পন্ন এবং তার জলবর্ষীবেগ প্রচণ্ড শব্দ করে প্রবাহিত হতো। এককথায় সরস্বতী নদী তখন তীব্রবেগ সম্পন্ন ছিল। জলের প্রাচুর্য ছিল এবং কঙ্কময় পথ অতিক্রম করে আসার জন্যে তার গতিপথে শব্দ উঠতো। সরস্বতীর তীরে উর্বরা ভূমিতে উৎকৃষ্ট শস্য লাভে কৃতজ্ঞ আর্যরা তার বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছেন—'হে সরস্বতী, তুমি আমাদের

প্রশস্ত ধনে নিয়ে যাও, তুমি আমাদের হীন করো না। অধিক জলদ্বারা আমাদের উৎপীড়িত করো না। তুমি আমাদের বন্ধুত্ব ও গৃহ স্বীকার কর।' (৬।৬১।১৪) এই সূত্র পাঠে মন হয়, সরস্বতী নদীতে হয়তো মাঝে মাঝে ঢল নামতো। ফলে বন্যায় কৃষিক্ষেত্র, বাসস্থান প্লাবিত হতো।

জলসেচের সাহায্যে চাষ

বছরের নানা সময়ে প্রকৃতি যে বৃষ্টি দেয়, তার উপর নির্ভর করে থাকা নিরাপদ হয় তা বৈদিক আর্যরা জানতেন। তাই তাঁরা কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা করতেন। গভীর কূপ ও নালা খনন করে শস্যক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা হতো। জলসেচকারী কৃষকদের কথা ১০'মণ্ডলের ৬৮। ১ সূক্তে উল্লেখ করা হয়েছে—'যেরূপ জলসেচকারী কৃষকগণ পক্ষীদিগকে শস্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় কোলাহল করে···' (ঋগ্বেদ-রমেশ দত্ত)।

ঋগ্বেদে 'কূপ' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে ভূপৃষ্ঠে কৃত্রিম গর্ত খোঁড়ার বিষয়ে। ঋগ্বেদের ১।৫৫।৮; ১।৮৫।১০; ১।১১৬/৯ থেকে ১।১১৬।১০, ১।১১৬।২২, ৪।১৭।১৬; ৮।৬২।৬।; ১০।২৫।৪ সূক্তে অবত বা ভূগর্ত, গহ্বর বা কূপ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি যে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। এইসব কূপকে বলা হয়েছে অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত। পাথরের চাকার সঙ্গে বাঁধা হতো পাত্র বা জলাধার। পাত্রকে বলা হতো 'আহাব'। কূপের জল পশুরা পান করতো, কৃষিভূমিতে সেচ দেওয়া হতো। বড় বড় খাল কেটে কূপের জল নিয়ে আসা হতো ক্ষেতের মধ্যে। কূপ অনেকক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীর হতো, হঠাৎ যদি কেউ পড়ে যেতেন তাহলে তাঁকে উদ্ধার করতে অপরের প্রয়োজন হতো। 'খণিত্রিমার' উল্লেখ আছে ৭।৪৯।২ সূক্তে। খণিত্রিমা হলো জলনিকাশের জন্যে কৃত্রিম নালী। নদী থেকে খাল কেটে জল নিয়ে আসতে জানতেন বৈদিক আর্যরা। কূপ থেকে জল তুলে চাষ করার পদ্ধতি পাঞ্জাব ও রাজপুতনায় (রাজস্থান) এখনও আছে। তবে আধুনিক কালে গভীর কূপ খনন করে ইলেকট্রিক পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রাচীন কালে কূপ থেকে সেচের ব্যবস্থা করা হতো সম্ভবতঃ শীত ও বসন্ত ঋতুতে। কারণ এই সময়ে বৃষ্টির জলের অভাব হয়, আর বসন্ত ঋতুর অন্যতম প্রধান শস্য যব উৎপাদনের জন্য জলসেচের প্রয়োজন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০১ সূক্তে দেখি বৈদিক ঋষিরা বলেছেন, 'মন্দ্রা কৃণুধ্বং প্রিয় আ তনুধ্বং নাবমরিত্র পরণীং কৃণুধ্বং। ইষ্কৃণুধ্বমায়ুধারং কৃনুধ্বং প্রাঞ্চং যজ্ঞং প্রণয়তা সখায়ঃ। যুণক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজং। গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্কমেয়াৎ। সীরা যুঞ্জতি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নয়া॥ নিরাহাবান্ কৃণোতন সং বরত্রা দধাতন। সিঞ্চামহা অবত মুদ্রিণং বয়ং সুষেকমনুপক্ষিতং॥ ইষ্কৃতাহাবমতং সুবরত্রং সুষেচনং। উদ্রিণং সিঞ্চে অক্ষিতং॥ (১০।১০১।২—৬)।

অর্থাৎ লাঙ্গলগুলি যোজনা কর, যুগগুলি (জোয়াল, যা বলদের স্কন্ধে চাপানো হয়) বিস্তৃত কর এই সীতা বা হলকৃত রেখার মধ্যে (যোনৌ) বীজ বপন কর। আমাদের স্তবের সঙ্গে অন্ন পরিপূর্ণ হোক। সৃণিগুলি বা কাস্তে (কাচি) যেন চারদিকে পাকা শস্য গ্রহণ করতে পারে। ঋষিরা কামনা

করছেন যেন চারদিক পাকা শস্যে ভরে ওঠে, মনের সুখে কাস্তে দিয়ে পাকা ফসল কেটে তুলতে পারেন। লাঙ্গলগুলি যোজিত হচ্ছে। কর্মকারেরা জোয়ালগুলি পৃথক করছে। বুদ্ধিমানেরা দেবতাদের উদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়ছেন। জলপানের স্থান প্রস্তুত কর। বরত্রা (চর্মরজ্জু) যোজনা কর। এই জলপূর্ণ ক্ষয়রহিত কূপ থেকে জল সেচন করা সহজ। চল আমরা জল সেচন করি। জলপানের স্থান পরিষ্কার করা হয়েছে। কূপে সুন্দর চর্মরজ্জু সংস্থাপিত হয়েছে। এই কূপ থেকে জল সেচন করা সহজ। কারণ ইহা জলশালী। এর জলের শেষ নেই। চল, জল সেচন করি।

বৈদিক যুগে এদেশে সম্ভবত বলদ এবং ঘোড়া উভয়ের সাহায্যেই চাষের কাজ করা হতো। সায়নাচার্য 'অশ্ব' শব্দকে 'বলদ' নামে চিহ্নিত করলেও তখনকার দিনে ঘোড়া দিয়ে চাষ আবাদের কথা সত্যি বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য খণ্ডে ঘোড়া দিয়ে চাষ করার নজির যথেষ্ট আছে।

পশুদের জলপানের জন্যে স্থানে স্থানে তৈরি করা হতো জলাধার অর্থাৎ কূপ। তাতে পাথরের চাকা লাগানো থাকতো। পশুপালন পদ্ধতি তাঁরা ভাল ভাবেই জানতেন কারণ তাদের সাহায্যেই কর্ষণ করা সম্ভব। ব্রজ বা গো-বিচরণ স্থান প্রস্তুত করা হতো। সেখানেই মানুষের পানস্থান খনন করা হতো বলে মনে হয়।

দশম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের ৮ মন্ত্রে আছে—বহুসংখ্যক স্থূল কবচ সীবন কর, দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নিষ্কাশিত কর। চমস বা চামচ দৃঢ়ীভূত কর। (ঋগ্বেদ-রমেশ দত্ত)।

কৃষি পদ্ধতি

উর্বরা ভূমি চাষের জন্য নির্বাচিত করা হতো। উর্বরা-প্রান্তর সমূহ বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হতো। অংশকে বলা হতো ক্ষেত্র। তখনকার দিনে প্রচলিত পরিমাপক একক সাহায্যে ক্ষেত্র বা জমি মাপা হতো (ঋগ্বেদ ১।১১০।৫)। প্রতিটি পরিবারের অধীনে কয়েকটি জমি বণ্টন ক'রে দেবার ব্যবস্থা ছিল। আজকের দিনে জমির যেমনি হোল্ডিং নম্বর থাকে, বৈদিক যুগে তেমনি কোন ব্যবস্থা ছিল তার আভাস পাওয়া যায়। অথর্ববেদে (৮।১০।২৪) পৃথিবৈন্যকে প্রশংসা করা হয়েছে লাঙ্গল উদ্ভাবনের জন্যে। তিনি লাঙ্গল উদ্ভাবন করেছিলেন মাটি খোঁড়ার জন্যে। মাটি ভালভাবে কর্ষণ করা হলে বীজ বোনার উপযুক্ত হবে। আজও এই রকম ব্যবহার লাঙ্গলের।

ঋগ্বেদের ১।১১২।১৬ সূক্তে আছে অশ্বিদ্বয় মনুকে বীজ বপনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন আর আর্যদের দিয়েছিলেন লাঙ্গল দিয়ে চাষ করবার কৌশল শিক্ষা (১।১১৭।২১)। এই আদিম লাঙ্গলকে উন্নততর করেছিলেন পৃথু। নিওলিথিক যুগে লাঙ্গলের সঠিক চেহারা কেমন ছিল তা বলা মুস্কিল কিন্তু ঋগ্বেদের সময়ে যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হতো, আধুনিক কালেও প্রায় একই রকম লাঙ্গল ব্যবহৃত হচ্ছে। এখনো জোড়া বলদ বা জোড়া অশ্বের কাঁধে লাঙ্গল চাপিয়ে চাষ করা হয়। লাঙ্গলের দণ্ডকে বলা হয় 'ঈশা'। এই শব্দটি ঋগ্বেদের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে আসছে। ঠিক তেমনি 'জোয়াল' শব্দটি।

ঋগ্বেদের কালে, লাঙ্গল সম্ভবতঃ হালকা ছিল আধুনিক কালের মত, মাত্র দুটি বলদ বা ঘোড়ার সাহায্যে চাষ করা যেত। পরবর্তীকালে লাঙ্গল নিশ্চয় ভারী হয়। অথর্ববেদে (৬, ৯১, ১) ছটি, তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১. ৮. ৭, ১) আট বা বারোটি; কাঠক সংহিতায় (১৫. ২) চব্বিশটি বলদ

বাহিত লাঙ্গলের উল্লেখ আছে। এখানে একটা প্রশ্ন মনে জাগে। ছয়, আট, বারো, বা চব্বিশ এগুলি কি সত্যিই বলদ বা অশ্বের সংখ্যা না অশ্বশক্তির পরিমাপ? অথর্ববেদের যুগে বৈদিক আর্যরা বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি করেছেন। তখন কি তাঁরা এমন কোন পদ্ধতি জানতেন যা আধুনিক ট্রাকটরের পূর্ববর্তী সংস্করণ? পূর্ববর্তী প্যারাগ্রাফে আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন অশ্বিদ্বয় মনুকেও আর্যদের বীজবপন ও লাঙ্গলের ব্যবহার শিখিয়েছিলেন। অশ্বিদ্বয়কে দেবতা বলে কল্পনা করা হয়েছে। অশ্বিদ্বয় অর্থে যদি দুই অশ্বিনীকুমার হন তাহলে তাঁরা পৌরাণিক দেবতা। প্রশ্ন জাগে অশ্বিদ্বয় যদি মনু ও আর্যদের কৃষিকাজের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা কি আর্য ছিলেন না? তা যদি না হন তবে তাঁরা কি ভারতের আদি অধিবাসী ছিলেন—একথারও সদুত্তর মেলে না। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার যুগে বা মানা সভ্যতার সময়ে বহু উন্নত কারিগরী নিদর্শন পাওয়া যায়। অশ্বিদ্বয় তাঁদের কেউ এমন কথাও বলা হয় নি। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে অশ্বিদ্বয় বৈদিক আর্যদের চেয়ে উন্নততর মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন। তাহলে তাঁরা কোন জগতের অধিবাসী? অন্য কোন গ্রহের কি? এরিথ ফন দানিকেনের লেখা 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ' (অনুবাদ-অজিত দত্ত) পড়লে এই ধরনের জিজ্ঞাসা সহস্রবার উঁকি দেয়।

বৈদিক আর্যরা কাঠের গাড়ী তৈরি করে তার মধ্যে শস্য বোঝাই করতেন। ঘোড়া টেনে নিয়ে যেত সেই গাড়ী (ঋগ্বেদ ১০।১০১।৭)। রথ তৈরীর কলাকৌশল তখন তাঁরা ভালভাবেই জানতেন।

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল এবং কীথ বলেছেন, ঋগ্বেদে 'শকৃৎ' (১।১৬১।১০) শব্দে গোবর বোঝায়। 'এর থেকে মনে হয় তাঁরা সারের উপকারিতা খুব ভাল করেই জানতেন' (Vedic Index, ii, 348)। অথর্ববেদে (৩, ১৪, ৩, ৪, ১৯।৩১, ৩) সূত্রে বা মন্ত্রে দেখা যায় আর্যরা পশুদের মল, মূত্রাদি ক্ষেতে সার রূপে ব্যবহার করা যায় তা জানতেন। ঋগ্বেদের সময়ে অধিকাংশ শস্যক্ষেত্র ছিল পলিমাটিতে ভর্তি, কারণ বর্ষার সময়ে নদীগুলি জলস্ফীতি হেতু প্লাবন ছাপিয়ে যেত। জল সরে আসার পরে পলিমাটি শস্যক্ষেত্রে পড়ে থাকতো। বোধহয় এ কারণে তখনকার দিনে নদীর কাছাকাছি জমিতে সার দেবার প্রয়োজন হতো না। তবে নদীর থেকে দূরে যে সব জমি সেখানে কৃত্রিম সার দেওয়া কষ্টকর ছিল না। আর্যদের গরু, ভেড়া, মোষ ইত্যাদি প্রচুর ছিল। জমিতে তাদের মল মূত্র জমা হতো পরে মাটির সঙ্গে মিশে যেতো। ফলে সেইসব জমি খুব উর্বরা হতো আর শস্য ও প্রচুর পাওয়া যেতো।

ফসল পাকলে কাঁচি বা কাস্তে দিয়া কাটা হতো। শস্যের আঁটি বাঁধা হতো (১০।৪৮।৭), শস্যভাণ্ডারের বারান্দায় শস্যের আঁটিগুলি আছাড় দিয়ে (১০।৪৮।৭) শস্যদানা পৃথক করা হতো। তারপরে চালুনির সাহায্যে খড় বা আবর্জনা শস্যদানা থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল (১০।৭১।২) অথবা কুলোর সাহায্যেও করা হতো (ঋ-১০।৭১।২)। ঝাড়াই-বাছাই এর কাজ যিনি করতেন তাঁকে বলা হতো ধান্যকৃৎ (১০।৯৪।১৩)। শস্যদানা পরিমাপ করার জন্যে ব্যবহৃত হতো একটি ধরনের পাত্র। তাকে বলা হতো উর্দার (২।১৪।১১)।

শস্যদানা যেখানে রাখা হতো তার নাম হলো স্থিভি (১০।৬৮।৩)। ম্যাকডোনেল ও কীথ বলেন স্থিভি আধুনিক কালের গোলাঘর বা শস্যাগার ছাড়া আর কিছু নয়। ধান বা যব ধূলোবালি

বিবর্জিত, উষ্ণ এবং ইঁদুর নিরোধক কক্ষে বোঝাই করে রাখা হতো ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে।

ঋগ্বেদে গোধূমের উল্লেখ নেই। তাই মনে হয় গম চাষ তখন হতো না। সেসময়ে বৈদিক আর্যরা যবের ময়দার সঙ্গে দই বা ঘি মিশিয়ে 'করম্ভা' নামে একধরনের পরিজ তৈরী করতেন। এই দ্রব্য প্রথমে উৎসর্গ করা হতো পুষণকে। পুষণকে বলা হতো গবাদি পশুর দেবতা। যব বা চালের গুঁড়োর সঙ্গে ঘি মিশিয়ে তৈরী করা হতো 'আপূপ' নামে পিঠে (ঋ—৩।৫২।৭) দুধের সঙ্গে চাল মিশিয়ে জাল দিয়ে যা তৈরী হতো তার নাম ছিল 'ওদন' (৮।৬৯।১৪; ৮।৭৭।১০)।

বৈদিক আর্যদের গো সম্পদ প্রচুর ছিল। তাই দুধ পেতেন প্রচুর। একারণে দুধ তাদের অতি প্রিয় পানীয় ছিল। 'পায়স' শব্দটি ঋগ্বেদে বহু স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। আর্যরা মাংসও খেতেন প্রচুর। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে তখন শীতের তীব্র প্রকোপ। দেহকে উত্তপ্ত রাখার জন্যে নানাবিধ খাদ্য তাঁরা গ্রহণ করতেন। মাংসও তার মধ্যে অন্যতম।

ঋগ্বেদে প্রাচীন আর্যদের বিজ্ঞানচিন্তার স্বাক্ষর বহন করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব, কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে তাঁরা দিয়ে গেছেন ব্রহ্মবিদ্যা। ঋষিরা তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে দিয়ে গেছেন সত্যের স্বরূপ। সেই রহস্যের মুখ তাঁরা ঢেকে রেখেছেন রহস্যময় বাকজাল দিয়ে। যাঁরা অপাবৃত করতে পারেন সেই মুখ তাঁরাই সত্যদর্শন করতে পারবেন। তাই বলতে হয় বাঙ মে মনসি প্রতিষ্ঠাতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্। আবিরাবীর্ম এধি বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে সা প্রহাসীঃ।' আমার মনে প্রতিষ্ঠিত হোক বৈদিক বাক। আমার মন প্রতিষ্ঠিত হোক বেদবাক্যে। সত্য আবির্ভূত হোক আমার কাছে। আমি যেন বেদের কেন্দ্রস্থ বিজ্ঞানশ্রুতি পরিহার না করি।

ভারতীয় প্রেক্ষিতে বাঙলা-কলম

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

লোকায়ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধহয় বাঙলা-কলমের বিবর্তনশীল রূপটির সন্ধান বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নিছক লোক-শিল্প হিসেবে বাঙলা-কলমের আবির্ভাব কিংবা সাম্প্রতিক রূপগ্রহণ ঘটেনি, চিত্রশিল্পের সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে তার স্বতন্ত্র বিকাশ ওতপ্রোত। বাঙলা কলমের সামগ্রিক চরিত্রোপলব্ধির উপক্রমণিকা হিসাবে তাই স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্মারক-পঞ্জীতে বঙ্গজ চিত্র-কলার কী কী চিহ্নিত কালপর্ব আছে এবং তদনুযায়ী এই ধারার রূপান্তর ঘটেছে কেমন ভাবে। এই রূপান্তর সাধনে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চিত্র-কলার সঙ্গে বঙ্গীয় ধারাটির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ী ভূমিকার তাৎপর্যও এই সূত্রে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া বাঙলা-কলমের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন সামাজিক প্রেক্ষিতে তার সঙ্গে বিভিন্ন কারুকলার আত্মীয়তা নির্ণয় ভারতের লোকপ্রিয় চিত্রকলার ও সেই সঙ্গে দরবারী-মন্দিরী চিত্রকলার অন্যান্য আঞ্চলিক শাখার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাঙলার নিজস্ব লিখনধারার বৈশিষ্ট্যগুলি (বিশেষত শিল্পকৌশলগত ও নান্দনিক চারিত্র্যের) বিশ্লেষিত এবং তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন।

বাঙালী কবে যে লেখার কাজ সুরু করে তা আলো-আঁধার হলেও এই শিল্পকে আদৌ অর্বাচীন আখ্যা দেওয়া যায় না। খৃঃ ৪র্থ শতকে তাম্রলিপ্ত ছবি লেখা চলছে এমন সমাচার অবিদিত নয়। অঙ্কিত সামগ্রীর উপাদানগত নশ্বরতার জন্য ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের তুলনায় প্রাচীন লেখা-নমুনা তেমন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে লেখার ইতিহাসে পাল-যুগকে প্রথম মুখ্য কালপর্ব বলে ধরা উচিত। পালপূর্ব-যুগের দুয়েকটি চিত্রিত পাটা পাওয়া গেলেও তা' থেকে শিল্প বৈশিষ্ট্যের কোন সাধারণীকরণ উচিত কাজ নয়। পাল-যুগেই বঙ্গজ শিল্পধারার চারিত্র্যের প্রথম বিকশিত রূপ আমরা দেখতে পাই। এই যুগের লিখিত ইতিহাসে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয়বিধ উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তখনকার দিনে মঠ-মন্দির, চৈত্য-বিহার প্রায় আপাদমস্তক চিত্রিত থাকত। কিন্তু পাল আমলের শিল্পীদের কলানৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা সৌধচিত্র নয়, পরন্তু প্রাচীর-চিত্রের লক্ষণাক্রান্ত গরিমাদীপ্ত পুঁথিচিত্র। মোটামুটি দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার এই রকম ২০।২২টি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ও ৩টি তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্র পাওয়া গেছে! পুঁথির অলঙ্করণকল্পে অঙ্কিত এই চিত্রগুলিতে মুখ্যতঃ ধ্রুবপদী চিত্রাদর্শ অনুযায়ী বিস্তারপ্রবণ ধাবমান বঙ্কিম রেখার নিপুণ শাসনে এবং রঙের কুশলীমণ্ডলে সমৃদ্ধ ভৌলের সৃষ্টি করা হয়েছে। এইসব পুঁথিচিত্রের বিন্যাস ও রূপায়ণের ভঙ্গিমাতে সমকালীন মূর্তিশিল্পের প্রতিভাস সুস্পষ্ট। চিত্রগুলির পরিসর সঙ্কীর্ণ হলেও তাতে ক্ষুদ্রায়তন চিত্রের পরিবর্তে যেন প্রাচীরচিত্রের লক্ষণগুলিই প্রবল। আলোছায়ার সৃষ্টি ব্যতিরেকে তুলির দ্রুসাহক দ্রুততানে বিদ্যুৎগতি দূরাপসারী, প্রাণবন্ত রেখার সাহায্যে এবং উদার বর্ণপ্রলেপের মণ্ডন-কৌশলে এই অলঙ্করণ চিত্রগুলিতে যে অনায়াস ত্রৈমাত্রিক পরিপূর্ণ ভৌল সঞ্চারিত, লক্ষ্য করলে তার মধ্যে চিরায়ত বাঙলা-কলমের রঙ ও রেখার মণ্ডনবৈশিষ্ট্যের দূরাগত পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

সুন্দরবন ও চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রপট্টের চিত্রগুলির শিল্পাদর্শ আবার মুখ্যতঃ মধ্যযুগীয় তীক্ষ্ণ, ভৌলনিরপেক্ষ, ঈষৎ কৌণিক রেখার প্রাচুর্যনির্ভর পশ্চিম ভারতীয়, বিশেষতঃ গুজরাটি জৈন পুঁথিচিত্রের চিত্রাদর্শের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য প্রকট হলেও বঙ্গীয় তাম্রপট্টোৎকীর্ণ বৈথিক শিল্পকর্মগুলি তুলনায় অধিকতর পেলব ও তীক্ষ্ণতাবর্জিত এবং তাদের সমর্থ রেখাগুলি আর বেশি আত্মপ্রত্যয়ী, ভাবপ্রকাশক্ষম ও অভঙ্গ সজীবতায় সরস।

পালযুগের চিত্রকলার তাৎপর্য শুধু এই নয় যে তা বাঙলা তথা প্রাচ্যভারতের পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করেছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে যেমন একে প্রাচীনযুগের সর্বভারতীয় ধ্রুপদী চিত্রাদর্শের একটি শেষ সফল অনুস্মৃতি বলা চলে, তেমনি অন্য দিক থেকে দেখলে বলতে হয় যে, ৭ম শতকোত্তরকালে সর্বভারতীয় সার্বভৌম মানদণ্ড থেকে বিবর্তিত হয়ে ও সনাতন চিত্ররীতির বিভাজনের মধ্য দিয়ে যে আঞ্চলিক ধারাপ্রবনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, তা সর্বপ্রথম সুষ্ঠু রূপ পরিগ্রহ করে দানা বেঁধে ওঠে পাল আমলের চিত্রশিল্পের মধ্যে।

পালযুগের বঙ্গীয় চিত্রকলার বিবর্তনের বৃত্তান্ত উত্থাপনের অন্যান্য আঞ্চলিক শিল্পধারার প্রসঙ্গ স্বাভাবিক কারণে এসে পড়ে। খৃঃ ১৩শ ১৪শ শতকে পশ্চিম ভারতে যে গুজরাটি জৈন পুঁথিচিত্রের ঘরানা সৃষ্টি হয় তাকে পাল ও মুঘল আমলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে আঞ্চলিক চিত্রধারার সমুথান ও বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলা চলে। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৭শ শতকের মাঝামাঝি, গুজরাটি পটে রাজপুত ও মুঘলরীতির ছায়া পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এই ধারার বৈশিষ্ট্য ছিল লিপিরচনায় অসামান্য দক্ষতাজনিত রেখাঙ্কণের অত্যুৎকৃষ্ট মান। অনায়াস দ্রুততার সঙ্গে অঙ্কিত বহিঃরেখার জন্য এবং সমতল রঙের প্রলেপ ও বেরিয়ে আসা অবয়ব-রেখার সাহায্যে মাত্রার ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলার জন্য সচরাচর গুজরাটি কলমের যে বিরোধী সমালোচনা করা হয়, আধুনিক চিত্রাদর্শের বিচারে তা আর নিন্দনীয় নয়, বরং নির্ভীকতার নমুনাসাক্ষ্য। বাঙলা কলমে প্রথাবিরোধী চিত্রাদর্শ তথা নির্ভীকতা আবহমানকাল রয়েছে।

গুজরাটের সমসময়ে রাজস্থানে যে চিত্ররীতি মার্জিততর চেহারায় দেখা দিয়েছিল, গুজরাট কলমের প্রতি তার প্রারম্ভিক অকিঞ্চিৎকর ঋণ সত্ত্বেও বিদগ্ধ ও পরিশীলিত লালিত্যে ও আবেগময়তার গুণে অচিরেই তা স্বতন্ত্র মহিমা অর্জন করল। প্রকৃতপক্ষে রাজপুত লিখনকাজের প্রাণই ছিল ক্ষুদ্রায়তন কাগজের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে হস্তাস্থপাতিক কৌশলে প্রাচীর চিত্রাঙ্কণ ও তৎসহ বয়নশিল্প সংক্রান্ত চিত্রণের ঐতিহ্যবাহী রীতি প্রয়োগ, তদুপরি তাতে আঞ্চলিক লোকায়ত চিত্ররীতির বলিষ্ঠতার আরোপে দার্ঢ্য আনয়ন। পরবর্তীকালে মুঘল দরবারের জাঁকজমকের মোহে বাদশাহী বিলাসব্যসন ও শিল্পকলার সর্বাঙ্গীণ অনুকরণ ও অনুশীলনের ব্যাপক জোয়ারে ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত কলমে যখন দরবারী মিনিয়েচারের লোকোত্তর নৈপুণ্য ও গীতিময় সৌকুমার্যের ছোঁয়াচ লাগল, তখন কিন্তু প্রথমযুগের মৌল লোকায়ত চরিত্র থেকে কদাচ তা ভ্রষ্ট থেকেছে।

দিল্লীর মুসলমানদের বিজেতাদের মধ্যে মুঘল শাসকরা শিল্পকলার চর্চায় প্রবল উৎসাহ জুগিয়ে কালক্রমে ভারতীয় শিল্পের বিবর্তনে প্রায় সর্বক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। আবহ্য সংস্কৃতির পরিবর্তে বিলাসপ্রবণ ও গীতিময় সংবেদন শীলতায় স্পন্দিত পারসিক রুচির দ্বারা মুঘলযুগের শাসককুল ও

অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্ত আচ্ছন্ন ছিল। প্রথম প্রথম পারসিক চিত্র ও চিত্রশিল্পীর সমাদরে নিরত থাকলেও ক্রমে পারসিক চিত্রগুরুর, হয়ত বা ঐকলব্যীয় দীক্ষায় শিক্ষিত স্থানীয় শিল্পীদের বিমিশ্ররীতিতে অঙ্কিত চিত্রের পৃষ্ঠ পোষণাতেও তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। ফলে পারসিক ধারার সঙ্গে দেশীয় প্রতিভার মিলনে জন্ম নিল জগৎ বিখ্যাত মুঘল কলম। ভারতের চিরাচরিত লোকায়ত চিত্রাদর্শ ও প্রাচীন চিত্রধারার সঙ্গে পারস্যের পুথিচিত্রণ ও লিপিকৌশলের এক বলিষ্ঠ সমন্বয় এই কলমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল। এই সমন্বয়ী কলমের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা গেল ছবির মৃদু আদোল, অঙ্কিত বিষয় বস্তুর উপযোগী পটভূমি চিত্রণ, সূক্ষ্মতা ও সংবেদনশীলতার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ এক স্থৈর্যপরায়ণ বাঙ্ময় বহিঃরেখা, আলো-আঁধার সৃষ্টির প্রয়াস এবং সে যুগের তুলনায় প্রাগ্রসর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপদান রীতি। একদিকে পারসিক কায়দায় ক্যালিগ্রাফী বা লিপিরচনা সুলভ অতুলনীয় পরিমিতি সৃষ্টি ও পরিণত রূপদান কৌশল, অন্যদিকে ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোকায়ত চিত্রধারার ছন্দোময় তুলির আঁচড়ে দীর্ঘায়ত বঙ্কিম রেখার বিভ্রম বিলাস—এই দুই বিষম ধারা মিলেমিশে এমন পরম কমনীয়, সূক্ষ্ম ও পরিণত রেখ-সৌন্দর্য সৃষ্টি করল যার মেজাজের সঙ্গে পার্থিব কোন তুলনাই যেন তুলনা নয়।

রাজপুতনার বিভিন্ন সামন্তকুল ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী রাজ্যের দরবারগুলি বেশ কিছুদিন ধরে সনাতনধারায় দীক্ষিত শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল কলমে পারদর্শী শিল্পীদেরও পৃষ্ঠপোষণা করে আসছিলেন। নাদিরশাহী আক্রমণের পর মুঘল সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হতে আরম্ভ করলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা এড়াতে শিল্পীরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে একে একে দেশীয় রাজন্যবর্গের দরজায় কড়া নাড়াতে লাগলেন। এই পরিস্থিতিতে আগন্তুক মুঘল কলমের সঙ্গে আঞ্চলিক চিত্রধারার পুনর্বার মিশ্রণে নতুন নতুন বর্ণসঙ্কর কলমের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। পাহাড়ী কলমগুলি ছাড়া আরো কিছু আঞ্চলিক মিশ্রিত চিত্রাদর্শ গড়ে উঠল লক্ষ্ণৌ, পাটনা, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং কোন-কোন নতুন কেন্দ্রে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের কয়েকটি সন্ধিক্ষণে বাঙলাকলম নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে নেহাৎই দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এমন উদ্ভট অনুমানের কোন পরাম্পর্য খুঁজে পাওয়া যায়না। বরং বলা যায় বাঙলার ঐতিহ্যানুসারী লিখনাদর্শ বারংবার বহিরাগত প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছে, গ্রহণ করেছে প্রয়োজন ও সাধ্য অনুসারে এবং অঞ্চলান্তরের চিত্রধারায় নিজ বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করেছে। তাছাড়া গ্রামজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অগণিত চারু ও কারুশিল্পের প্রকাশভঙ্গী, ভাব ও ভাষা আত্মস্থ করে কখনো কখনো সরাসরি বহিরাগত প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাঙলাকলম ঋদ্ধি ও বিবর্ধনের মুখ দেখেছে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের মধ্যে পরিপূরক সহযোগিতার বিস্তৃত আয়োজন ঘটিয়ে!

দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণ থেকে আরম্ভ করে উৎসব-পরবের সামগ্রী পর্যন্ত সবকিছুকে শ্রীমণ্ডিত ও অলংকৃত করে তোলার ব্যাপারে বাঙালীর সহজাত শিল্পচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। গ্রাম-বাঙলার নিস্তরঙ্গ, মন্থর জীবনে বৈচিত্র্য ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য বর্ণবিলাস ও রূপসৃষ্টির সহায়তায় শোভাবর্ধনের একটি স্বাভাবিক তাগিদ আবহমানকাল রয়েছে। গার্হস্থ্যশিল্পের অজস্র সামগ্রী বরাবরই বাঙলাকলমকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুখ্যমাধ্যম করেও কখনো কখনো অঞ্চলান্তর বা ভিন্ন জাতের শিল্পভাষাকে আত্মস্থ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন গার্হস্থ্যশিল্পের মধ্যে আদান-

প্রদান ব্যবস্থা আভ্যন্তরীণ প্রভাবচক্র সৃষ্টি করেছে যা বাঙলাকলমকে ঋদ্ধ করে তুলেছে এবং সময়ে অসময়ে নতুন সৃষ্টি ও পথান্বেষণে প্রেরণা জুগিয়েছে।

ভঙ্গ নবাবীযুগে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার কালিঘাট এবং কুমারটুলিকে কেন্দ্র করে বাঙলা কলমের এক নাগর সংস্করণের আবির্ভাব ঘটে। দেবদেবীর সর্বাঙ্গে, চালে, ঘটে-পটে, কুলোয়, পুতুলনাচের পুতুলে কিছু পরিমাণে রূপান্তর সাধিত যে লেখনিক নমুনা দেখা দিয়েছিল সেই স্ফুরিত বিদ্যুৎরেখাও বাঙলাকলমের অবদান। আজকের দিনে, সহস্র সংমিশ্রণের পরও দৃঢ়, মিতবাক্, ঋজু, প্রত্যক্ষ অথচ কমনীয় যে ছন্দোময় বহমান রেখগতি দেশীয় লিখনশিল্পের যে নমুনা দেখি বাঙলাকলম দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে আপাততঃ সেখানেই সশরীরে বিদ্যমান। সেই সনাতন দ্রুতাঙ্কন আদর্শকে সম্বল করে সেই মুখের বহিঃরেখার আদলে কণ্ঠীর ভিত্ত দেখানোয় সেই অভঙ্গ বলিষ্ঠতায় বাঙলাকলম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

মানভূমের কথ্যশব্দার্থ

রামশঙ্কর চৌধুরী

ল্যাক্ষায় = কৃতার্থ
লেজানী = শ্মশান যাত্রী
ল্যাকৃলিকা = অতি সরু, একটু নাড়ালেই যার অগ্রভাগ ঝুলে পড়ে।
ল্যাকা = হাবা গোবা।
ল্যানা = বোকা।
ল্যালান = পিছনে লেলিয়ে দেওয়া।
ল্যাসাড়া = হাত দিয়ে প্রলেপ দেওয়া।
ল্যাপা = ঐ
ল্যাদা = যার কোমর সোজা নয়।
লল্‌কার = খোসামুদি করা।
ল্যাহাল = কৃতার্থ।
লেংগি = চলার সময় অকস্মাৎ পায়ে করে আটকে দেওয়া।
লেগ্‌ = নিয়ম, রীতি।
লুকলুকানি = লুকোচুরি।
লাতা = ন্যাতা।
ল্যাড়া = যে বাম হাত দিয়ে সব কিছু করে।
লিভা-ন = নির্বাপিত করা।
লিভা = নির্বাপিত।

শ

শরাবণ্‌ = শ্রাবণ।
শরদল্‌ = বারান্দা।
শুগুনি = শকুনি।
শীতল = গৃহদেবতার সন্ধ্যার ভোগ।
শুয়া = শোয়া।
শুগুনি = শাক্‌ বিশেষ।
শিকা = জিনিস রাখিবার জন্য দড়ির ফাঁস
শলি = ধান মাপ্‌বার হাড়ী।
শিথ্‌—শয্যা।
শালুক্‌—কৌমুদী।
ষাট—ষষ্ঠী
ষেটা-র—ষষ্ঠী পূজা। প্রসবের ছয় দিনের দিন প্রসূতি ষষ্ঠী পূজো করতে যায়।

স

সাঁঝ—সন্ধ্যা।
সাঁগা—মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিবাহ।
সাঁড়া—পুং বীজ।
সাঁড়ী—স্ত্রী জীব।
সাঁগুটা—ছড়িয়ে থাকা বস্তু জমা করা।
সঁপোর্যা—লংকা।
সোৎ—স্রোত, একটি রোগ বিশেষ।
সিনান—স্নান।
সিজ্জন—সৃষ্টি।
সিজা-ন—সিদ্ধ করা, একটি উৎসব। এই উৎসব শ্রীপঞ্চমীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। একটি নূতন হাঁড়ীতে দু তিন রকম কলাই, বিজোড় সংখ্যা বেগুন সিদ্ধ করে রাখা হয়। শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন অরন্ধন।
সাদ্‌ ভাত—প্রথম পোয়াতীকে নয় মাসে নানা ব্যাঞ্জন সহযোগে যে ভাত দেওয়া হয়।
সমদ্‌—সম্বন্ধ।

সদর—সোদর।
সেনী—পুকুর থেকে জল সেচ করার করার জন্য টিনের তৈরী স্যুপ সদৃশ পাত্র। এই পাত্রের দুই পাশে দুটি করে লম্বা দড়ি সংযুক্ত থাকে। দুটি মানুষ দুদিকে দাঁড়িয়ে পুকুর থেকে জল তুলে ছুড়ে দেয়।
সপ—মাদুর।
সপ-সপ—অত্যন্ত সিক্ত, তাড়াতাড়ি যথা সপ সপ করে খাঁয়্যা নে।
সরু হুটা—কঞ্চির মত পাৎলা-দুবলা।
সাঁতুলা—তেল বা ঘি দিয়ে ছকা।
সরা—মাটির তৈরী ঢাকনা।
সরাখেলা—বিয়ের পরে বর-কনেকে নিয়ে একটু অনুষ্ঠান।
সিঁধ্‌ বা সিন্দ—চুরি করিবার জন্য দেয়ালের কোনো অংশ ছাড়িয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে যাবার পথ।
সিধা - কোন অনুষ্ঠানের পর চাল কলাই এবং আলুতে প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া।
সিদা—সোজা।
সঁদা—গন্ধ বিশেষ।
সিঁদা—ঢুকে পড়া।
স্যাইর—হাঁড়ীর উপরে হাঁড়ী সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা।
সাঁগুটা—জড়ো করা।
সড়-সড়ে—খরগোশ।
সরাণ—গাড়ীর চাকার দাগে যে পথ তৈরী হয়।
সড়প্‌—সড়ক।
সিতান্‌—শয্যার মাথার দিক।
সাপুটা—পাতলা থাপ্প হাত হাত দিয়ে শব্দ করে থাওয়া।
সাংঘা—কোঠা বাড়ীর কাঠের support
সাল্‌কি—ঠোঁটের দুই পাশে যে সাদা সাদা রং ধরে।
সাবু—সাগুদানা।
সাগনা—সজনে।
সাগনা-স্থটি—সজনে ডাঁটা।
সিরা—সরে যাওয়া।
সানকাড়া—ঘোমটা দেওয়া।

হ

হঁ—হাঁ।
হ—কথার শেষে যুক্ত অব্যয়।
হা—মুখ ব্যাদন।
হালি—নূতন (হালি পয়না।)
হাল—লাঙ্গল।
হালাক—দুর্বল।
হওয়া গাড়ী—মোটর গাড়ী।
হথানে—ওখানে।
হাটাল—বিটাল—যেখানে সেখানে যাওয়া উচিত নয়।
হাইল—চাকার প্রান্তে বৃত্তাকার লোহার পাৎ।
হড়পা—হঠাৎ বিধ্বংসী প্লাবন।
হড়কা—কোন বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে থাকার সময় বস্তুটি সরে যাওয়া।
হল-হল্যা—হেলে সাপ।
হাড়র্‌—মাঠের বড়ো গড়।
হিসাল—রান্নার স্থান।
হিসাল্‌ ঘর—রান্নাঘর।
হিলা—জোরে ঠেলে ঠেলে আলগা করা।
হেল্‌-দেল্‌—গুরুত্ব আরোপ, অচল অটল স্থির।
হেল্যা—হেলে গোরন।

হিলাবাত্তি—বলদকে চালনার জন্য ছোট্ট লাঠি।
হীড়—উঁচু জমি।
হুদ্‌কা—হঠাৎ উত্তেজিত বা খুব উৎসাহিত হয়ে যাওয়া।
হুড়া—মাথা দিয়ে আঘাত।
হুড়কা—দরজার ভিতরের খিল।
হাঁইড়া—মদভর্তি হাঁড়ি।
হোড়—গুণ্ডা, একটুতেই যে মারদাঙ্গা করে।
হোড়ামি—গুণ্ডামি।
হেড়ার—যন্ত্র।
হ্যাটাল্—ঢিল।
হ্যাদে—এখানে।
হিস্‌সা—হিসাব।

সমালোচনা

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী—১৩১৮, ৭৯, ৮০, ৮১। সম্পাদক—অশোক কুণ্ডু। রূপকল্প, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। ৭·০০+১০·০০+১২·০০+১৫·০০।

সাম্প্রতিক বাংলার যড়যন্ত্রমুখর জালজটিল যে মানসকুজ্ঝটিকা ও জনগণের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার মধ্যেও বাংলাসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েই চলেছে। নিরবধি প্রবহমান এই যুগ—যাত্রার যবনিকা নেই কোথাও, সৃজনশীলতারও অভাব নেই। কিন্তু প্রবহমান সাহিত্য সৃষ্টির প্রকল্প থাকলেও সৃজনশীলতার ঐতিহাসের রূপ অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে। নাটকের সূত্রধরের ন্যায় সাহিত্য-সৃষ্টির ধারাকে পারম্পর্য রূপে বিদ্বৎ সমাজে লেখনীতে না পরিবেশন করলে, পরবর্তী যুগে সাহিত্য রসপিপাসুদের কাছে তা বিশৃঙ্খল বলে মনে হবে। শ্রীঅশোক কুণ্ডু সম্পাদিত 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' পেয়ে ও তার বিস্তৃত প্রকল্প পাঠ করে সম্পাদক মহাশয়কে যথার্থ সাহিত্য-ঐতিহাসিক বলে না অভিহিত করে থাকতে পারলাম না। বিশেষতঃ যখন এই 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নবতর সংযোজনার সম্ভাবনা এনে দিচ্ছে। সাম্প্রতিক অর্থকরী ভাবনাকে উপেক্ষা করে সম্পাদক মহাশয় পুস্তকাকারে খুঁটিনাটি সাহিত্যিক বিষয়গুলি যেভাবে নব নব প্রকল্প খাড়া করে বঙ্গীয় সাহিত্য-রস-পিপাসুদের এক বিরাট অভাব মোচন করেছেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

পণ্ডিতেরা গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে বর্ষপঞ্জী লেখেন। কিন্তু সাহিত্যের বর্ষপঞ্জী? সেটা আবার কেমন? গত চার বৎসর ধরে তিনি যে 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' সম্পাদনা করে আসছেন, তার বিরাট পরিধিতে অনেক কিছুই দৃষ্টিপথে পড়ে। এতে আছে—বর্তমান সাহিত্যিকদের নাম ঠিকানাসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, সারা বছরের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সংবাদ, সেই বছরে পরলোকগত সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জীসহ সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ণ, জন্মশতবার্ষিকী অথবা সার্দ্ধ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ, বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনের পরিচিতি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার তালিকা, প্রতিবছরে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার প্রথম, বিশেষ ও শারদ সংখ্যার তালিকা, নূতন গ্রন্থতালিকা ও তার পরিচিতি প্রকৃতি।

কোন সাহিত্য গবেষক বোধ করি হাতের কাছে এমন একটা বই রেখে দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। তাছাড়া সাহিত্যের স্রোতোধারায় অতীত ও বর্তমানের সমন্বয়ের অস্তিত্বের ও প্রয়োজনীয়তায় যদি কেউ আস্থাবান হ'ন, তাহলে এর গুরুত্ব কতখানি বুঝতে পারবেন।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন লেখককে দিয়ে লেখানর জন্য যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে, তেমনি সেগুলি মূল্যবানও বটে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১৩১৮ সাল—অক্ষয়কুমার দত্ত/সনৎ মিত্র, বিদ্যাসাগর/প্রমথনাথ বিশী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর/অশোক কুণ্ডু, আচার্য যদুনাথ সরকার/গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, জীবন দার্শনিক ওড়ুদ/অন্নদাশঙ্কর রায়, সাধন

কুমার ভট্টাচার্য/অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যচর্চা/স্বপ্না কুণ্ডু, মানুষ প্রাণতোষ/প্রণতি মুখোপাধ্যায়, বিচিত্র সৃষ্টিতে শরদিন্দু/দেবদাস জোয়ারদার, অন্তরঙ্গ আত্মীয় নারাণ/জগদীশ ভট্টাচার্য, কুমুদরঞ্জন মল্লিক/ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র।

১৩৭৯ সাল—বাঙলা নাটকে রঙ্গালয়ের দান ও সাধারণ রঙ্গালয়ের ক্রমবিবর্তন/ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, বঙ্গদর্শন/অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, সাহিত্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ/ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, কবি অতুলপ্রসাদ সেন/ডঃ অরুণকুমার বসু, প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা/আশিস মজুমদার, কবি নরেন্দ্র দেব/অশোক কুণ্ডু, তারাশঙ্কর/ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার।

১৩৮০ সাল—রামমোহন ও বাঙ্গালীর আধিমানসিকতা/ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যচর্চা/সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী/শুদ্ধসত্ত্ব বসু, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী/ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন/সনৎকুমার গুপ্ত, সরলা দেবী/সোমেন্দ্রনাথ বসু, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়/শঙ্কর মিত্র ও স্বপন বসু, ভেরা রোভিকোভা/ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী/ডঃ প্রফুল্লকুমার পাল, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী/সনৎকুমাপ মিত্র, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন/নীরেন্দু হাজরা।

১৩৮১ সাল—রামনারায়ণ তর্করত্ন/ডঃ আশুতোষ ভট্টচার্য, প্রাচীনতা আধুনিকতা চিরন্তনতা ও মধুসূদন দত্ত/ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, যুগমূর্তি রাজনারায়ণ/ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, পাঁচকড়ি দে ও বাংলা রহস্য উপন্যাসের ধারা/অশোক কুণ্ডু, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী/ডঃ অরুণ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস/শ্রীসনৎকুমার মিত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ, কবি হেমলতা দেবী ও কবি অন্নদাসুন্দরী/নির্মলকুমার খাঁ, উত্তরা-র সুরেশচন্দ্র/ডঃ সুশীল রায়, নিশিকান্ত/শংকর মিত্র, দীপক চৌধুরী/অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ও সুদেব সানা, শঙ্করনাথ রায়/ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, মুজফ্‌ফর আহম্মদ/স্বপন বসু, বুদ্ধদেব বসু/ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, মুক্তিব্রতী বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়/হারাধন দত্ত, ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী/মুরারি ঘোষ, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন/নীরেন্দু হাজরা।

যন্ত্রমুখর কর্মজটিলতার মধ্যে আমরা তো অনেক তথ্যই গহীন অন্ধকারে হারিয়ে ফেলি। এমন কি যে মানুষটির সাহিত্য একদা আমাদের আনন্দসুধা দান করেছিল, সেই মানুষের কৃত সাহিত্যরচনাকে আমরা বিস্মৃত হ'তে কুণ্ঠিত হই না। শ্রীকুণ্ডুর 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' বোধ করি আর কোন কিছুকেই আমাদের বিস্মৃত হতে দেবে না। পাঠকসমাজ 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' প্রকাশনার অমরত্ব দাবী করতে পারে।

প্রফুল্লকুমার পাল

কোচবিহার জিলার পুরাকীর্তি—শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৯৭৪ ॥ পৃঃ ৭৬ ॥ চিত্র ১৬টি ॥ মানচিত্র ১ ॥ মূল্য ৪·০০ টাকা মাত্র।

পুরাবস্তু ও পুরাকীর্তি এখন নানাকারণে সরকারী কার্যক্রমের আয়ত্তে এসেছে। ইতিপূর্বে বাঁকুড়া ও

বীরভূমের প্রকাশন দুটি'র পরই জিলাভিত্তিক বর্ণানুক্রমিক বিবরণের এই পুস্তকটি হাতে এল। এই ধরণের প্রচেষ্টাকে সব সময়েই সমর্থন করা উচিত। কারণ এর ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ধারা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া সম্ভব হবে সর্বসাধারণের পক্ষে। একথা আশা করা যেতে পারে।

বইটিতে কয়েক পর্যায়ের প্রাককথনের পর একুশটি পৃষ্ঠায় লেখক কোচবিহারের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্পর্কে একটি প্রাথমিক বক্তব্য ধরে দিয়েছেন। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপরেখা, স্থানীয় পুরাকীর্তি ও ধর্মজীবনের রূপরেখা, কোচবিহার জেলার স্থাপত্য-ভাস্কর্য এই ক'টি ভাগে বিভক্ত করে নিয়ে ভূমিকাটি রচিত। গ্রামভিত্তিক বা জনপদভিত্তিক পুরাকীর্তি পরিচয় এর পরে ২২ পৃষ্ঠা থেকে ৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে আলোচ্য প্রকাশনটির মূল অংশে। এর পরে আছে কোচবিহারের স্থানীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্পর্কে ৬৩ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা। দুই পাতার গ্রন্থপরিচয় ও ছয় পৃষ্ঠার নির্ঘণ্ট ও ষোলটি পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোকচিত্রের মুদ্রণ দিয়ে বইটি শেষ হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণেই চোখেপড়ে যে মুদ্রাতত্ত্ব বইটির আলোচ্য বিষয় হলেও এখানে কোচবিহারের কোন মুদ্রার চিত্র দেওয়া হয়নি। সূচনায় রক্ষিত মানচিত্রের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করণ ও স্থান নির্দেশ করার কাজটি একরকম হলেও এই গ্রন্থমালার কোন পুস্তকেই আলোচিত অঞ্চলের জমির উচ্চ-নীচ গঠনকে উপযুক্ত ভাবে দেখানো হয়নি। বেশি খরচের মধ্যে না গিয়েও কেবলমাত্র রৈখিক নির্দেশ দিয়েও প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় জমির উপরিভাগের গঠনপ্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি।

আমরা যতদুর জানি যে সুষ্ঠু সূচীপত্র যে গ্রন্থের ও পুস্তিকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। কাজেই এই পুস্তকে একাধিক ভূমিকার নিয়ে এটিকে স্থান দেওয়াটা ঠিক হয়নি বলেই মনে হয়। সূচীপত্র সর্বদাই পৃথক পাতার সম্মুখ দিকেই রক্ষিত হওয়া উচিত।

এই গ্রন্থমালার তিনটি পুস্তক প্রকাশিত হবার পর নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পুরাতত্ত্বের সন্ধানের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের যোগসূত্র সম্পর্কে আরও সঠিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করতে হবে কারণ পুরাতত্ত্বের বহু সংবাদ আদিমজাতি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ও জীবনযাত্রা-সংশ্লিষ্ট উপাদানে ছড়িয়ে আছে। আর একটা ব্যাপারেও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। পুরাকৃতি বলতে কী কেবল সৌধকীর্তি বা পুরাতন ঘরবাড়ি, প্রাসাদ এই সমস্ত জিনিস বোঝান হবে না কেবলমাত্র বহনযোগ্য বা স্থানান্তরযোগ্য ক্ষুদ্রাকার প্রত্ন উপাদান বা প্রাচীন নিদর্শন সূচিত হবে। সবশেষে জানাদরকার যে পরিচায়ক গ্রন্থের মধ্যে সংগ্রহশালার, মহাফেজখানার অথবা ব্যক্তিগত সংগ্রহের অন্তর্গত প্রত্ননিদর্শনাদির কথা থাকবে কিনা? এই প্রকার কয়েকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে না জানিয়ে দিলে বইটি পড়ে যে কোন পাঠক হতাশ হয়ে পড়বেন।

কোচবিহারের ভৌগোলিক অবস্থান ব্রহ্মপুত্র ভাগীরথী অববাহিকার বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। এই দুই অববাহিকার উত্তর দিকের শীর্ষ দেশে থাকা কোচবিহার অবশ্যই সংস্কৃতি বিনিময়ের পথে একটি কেন্দ্র ছিল। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ বা প্রস্তরায়ুধ নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা এখানে কম নয়। হিমালয় সানুদেশ অতিক্রান্ত প্রাগৈতিহাসিক যোগাযোগের চিহ্ন ইতিপূর্বেই দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

থেকে পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্বের বিচার-বিবেচনায় মধ্যযুগীয় কালও উপেক্ষণীয় নয়। যদি একথা সত্য হয় তা'হলে একাধিক রেখাঙ্কন দিয়ে কোচবিহারের মধ্যযুগীয় দুর্গের আলঘ, আনুভূমিক ও প্রসারতার সীমানা চিহ্নিত নক্সা থাকতো পুস্তকটিতে।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের অবদান সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এখানে তাঁকে কেবলমাত্র তথ্যসংকলন ও গ্রন্থনা'র আখ্যায় জড়িয়ে দেওয়া হল কেন সেকথা ঠিক বোঝা গেল না। গ্রন্থমালায় আগের পুস্তকটিতে এরকমটিতো দেখা যায়নি।

পুস্তিকাটির সকল অংশের মধ্যে গ্রন্থকারের ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে গ্রন্থের সর্বোত্তম অংশ। কোচ ভাষার 'সনদ দলিল পুঁথি'র একাধিক ব্যাখ্যা সমন্বিত চিত্র থাকলে গ্রন্থটি আরও কাজের হয়ে উঠত। পুরাকীর্তি পরিচিতি'র মধ্যে পুস্তকটির লেখক পশ্চিমবঙ্গের ব্যবহারিক প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্বগত ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখেন। কাজেই লেখার ব্যাপারে তাঁকে আর একটু স্বাধীনতা দিলে তিনি নিশ্চয়ই যথার্থ আর্কিওলজীকল রিপোর্ট বা প্রতিবেদন অনুযায়ী পুস্তিকাটিকে সুন্দরতর করে তুলতে সমর্থ হতেন।

আমরা আশা করব যে এই গ্রন্থমালার পরবর্তী পুস্তক-পুস্তিকায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্ন অধিকারের দক্ষ কর্মীদের সরেজমিনে তদন্তের সঙ্গে লেখকদের জিলাভিত্তিক প্রতিবেদন একটি পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে তৈরি হবে।

যদি রাজ্যসরকার মনে করেন যে প্রাগৈতিহাস এই ধরণের পুস্তিকায় আলোচিত হতে পারে না তাহলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের একটি জিলা অনুযায়ী প্রাগৈতিহাসিক বিবরণ রচনা করলে ভাল হয়।

সন্তোষকুমার বসু

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি
রচনা : **শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
মূল্য : ৩'৭৫ টাকা

●

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি
রচনা : **শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী**
মূল্য : ২'৫০ টাকা

●

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি
রচনা : **ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়**
মূল্য : ৪'০০ টাকা

প্রত্যেকটি বই পুরাবস্তুর বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ ও বহু উৎকৃষ্ট আলোকচিত্রে সজ্জিত। ঝকঝকে সচিত্র প্রচ্ছদ, সুদৃঢ় বাঁধাই, উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা। যাবতীয় তথ্যসংবলিত মানচিত্র আছে প্রত্যেক বইতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়ের অধীক্ষকের কাছ থেকে পাইকারী খরিদের ক্ষেত্রে পুস্তক-ব্যবসায়ীরা ২০% কমিশন পাবেন।

●

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়
৩৮, গোপালনগর রোড
কলিকাতা-২৭

প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন
১, কিরণশংকর রায় রোড
কলিকাতা-১

প. ব, (তথ্য ও জনসংযোগ) ১৯৫/৭৫